সাহিত্য চিন্তা

শিবনারায়ণ রায়

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চার টাকা

মিত্রালয়ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
মানসী প্রেসঃ ৭৩ মাণিকতলা স্ট্রীট, কলি-৬ হইতে এস. এন্. ব্যানার্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য
চিন্তা
শিবনারায়ণ রায়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ও

আবু সয়ীদ আইয়ুব

করকমলেষু

॥ সূচীপত্র ॥

প্লেটোর সাহিত্য-বিচার

প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র হতে কবিকুলকে নির্বাসিত করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল যে, কবিরা চরিত্রহীন, অসংযমী এবং সত্যভ্রষ্ট। চরিত্রহীন, তার প্রমাণ তাঁরা পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন চরিত্র কল্পনা ক'রে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। অসংযমী, তার কারণ তাঁরা প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত এবং প্রেরণার ওপরে যে কোন সংযম চলে না এ তো সকলেরই জানা। আর যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অনুকরণের মধ্যে কবি-কল্পনা স্ফূর্তিলাভ করে, সেই কারণে সত্য কখনও কাব্যের ধ্যেয় হতে পারে না। সত্য অজর, অমর, অতীন্দ্রিয়। শুধু দার্শনিকের একাগ্র সাধনার মধ্যেই সত্যের প্রতিফলন সম্ভব। সুতরাং জ্ঞান, ন্যায়নিষ্ঠা এবং চারিত্রের ওপরে ভিত্তি ক'রে কোন আদর্শ রাষ্ট্র যদি গ'ড়ে তুলতে হয় তবে সে রাষ্ট্র থেকে, যত ব্যথিত মনেই হোক, কবিদের বিদায় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্লেটোর অন্যান্য চিন্তার মত কাব্য সম্বন্ধে এ যুক্তি পরবর্তী কালের পশ্চিমী ভাবুকদের মন আলোড়িত করেছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা কাব্যের সপক্ষে নানা কথা বলেছেন, তাঁদের অধিকাংশই প্লেটোর অভিযোগের মারাত্মক মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেন নি। সম্ভবত এক আরিস্টটলই বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্লেটোর দার্শনিক প্রত্যয়গুলিকে খণ্ডন করতে না পারলে কাব্য বিষয়ে তার অভিযোগের কোন যথার্থ সদুত্তর সম্ভব নয়। এমনকি সিডনির মত সুরসিক কাব্যানুরাগী এবং শেলীর মত খাশ কবির পর্যন্ত মনে হয়েছিল, প্লেটোর অন্যান্য প্রস্তাব মেনে নিয়েও কাব্য সম্বন্ধে তাঁর রায়কে বুঝি অগ্রাহ্য করা চলে। প্লেটোর মত কবিপ্রাণ দার্শনিক যদি শেষ পর্যন্ত কবিতার দাবি দর্শনের নামে খারিজ ক'রে থাকেন তবে তা যে অনেক ভেবেই করেছিলেন, এঁদের মত প্লেটোভক্তরাও সে কথা বুঝতে পারেন নি ভাবতে তাজ্জব লাগে।

প্লেটোর সিদ্ধান্তে কোন খাঁটি সাহিত্যরসিক স্বভাবতই সায় দিতে পারবেন না। কিন্তু সায় না দেওয়া এক কথা, আর এ সিদ্ধান্ত বেঠিক ব'লে খারিজ করা আর এক কথা। মনে রাখা দরকার, প্লেটো মূলত সাহিত্যসমালোচক ছিলেন না; তিনি দার্শনিক, পৃথিবীর সেরা দার্শনিকদের মধ্যে সর্বস্বীকৃতভাবে তিনি একজন। সুতরাং তাঁর বক্তব্যের সুবিচার করতে হ'লে যে-দর্শনের কষ্টিপাথরে তিনি সাহিত্যকে যাচাই করেছেন তার সঙ্গে নির্ভরযোগ্য পরিচয় থাকা দরকার। চারিত্র, সত্য, ও প্রেরণা বলতে প্লেটো যা বুঝেছেন তা যদি আমরা মেনে নিই, তবে সাহিত্য বিষয়ে প্লেটোর অভিযোগ খণ্ডন করা শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্লেটোর মতে আদর্শ সমাজে প্রতি ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং কর্মবিধি থাকা দরকার। তার জীবন এই দায়িত্ব এবং কর্মবিধির দ্বারা নিরূপিত হবে। যেমন, যে যোদ্ধা, তার জীবন ক্ষাত্র আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আবার যে দাস, তার সার্থকতা আদর্শ দাস হিসেবে গ'ড়ে ওঠায়। সমাজে নিজের নির্দিষ্ট স্থানটি মেনে নিয়ে সেই স্থানের উপযোগী হয়ে ওঠার নাম চারিত্র। নিজের স্থানানুযায়ী কাজ করার নাম ন্যায়, আর সে স্থানের অনুপযোগী কাজ করার নাম অন্যায়। প্রজা প্রজার মত থাকবে, রাজা রাজার মত। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের খেয়ালখুশিমত জীবনযাপন করতে চাইবে না। তার জীবন কর্তব্যের সরলরেখায় চালিত হবে এবং সে রেখা নির্দিষ্ট হবে সমাজসংগঠনের প্রয়োজন বিচার ক'রে। ব্যক্তিচরিত্রে কোন অস্পষ্টতা, জটিলতা, বিরোধ কি বহুমুখীনতা থাকবে না। আধুনিক জীবন থেকে উপমা নিলে যদি দোষ না হয় তবে বলা যায়, তার চরিত্র হবে কারখানায় তৈরী যন্ত্রের এক-একটি অংশের মত। যে বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যে সে তৈরী, সে উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে তার চরিত্র কতটা উপযোগী শুধু এটুকু

বিচার ক'রে ব্যক্তির মূল্য নির্ধারিত হবে। ব্যক্তির নিজস্ব কোন মূল্য নেই; সমাজযন্ত্রের অংশ হিসেবেই তার দাম। এ চিন্তার সঙ্গে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ এবং মার্কস্‌বাদী সমাজপরিকল্পনার সাদৃশ্য হয়তো অস্পষ্ট নয়।

চারিত্রের উপরোক্ত ব্যাখ্যা যদি আমরা মেনে নিই, তবে সাহিত্যিক যে চরিত্রবান অথবা চারিত্রের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল—এ কথা বলা চলে না। কেন না, সাহিত্যিকের কৌতূহল কোন বিশেষ কর্তব্য বা কর্মবিধির মধ্যে আবদ্ধ নয়। সমাজে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে সেই স্থানের উপযোগী হয়ে ওঠাতেই ব্যক্তির পরমার্থ, কোন সং সাহিত্যিক এ তত্ত্ব মেনে নিতে গররাজী। সাহিত্যিকের কারবার সেই মানুষকে নিয়ে, যে মানুষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিঃশেষিত নয়, যে মানুষের মন কোন পূর্বনির্দিষ্ট সরলরেখায় ধরা যায় না, যে মানুষ জটিল, বহুমুখী, আত্মবিভক্ত, যে মানুষ বহু সহস্র শতাব্দীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। সে মানুষের দেহমনের পরতে পরতে কত যুগের কত রূপান্তরের স্বাক্ষর প্রচ্ছন্ন; সে মানুষের অস্তিত্বে একই সঙ্গে আদিম অরণ্যের অন্ধকার স্মৃতি আর ভবিষ্যৎ সভ্যতার উজ্জ্বল পূর্বকল্পনা মিশে আছে। এই জটিল, জঙ্গম, অসম্পূর্ণ অথচ সমগ্র ব্যক্তিমানুষকে সমাজপরিকল্পনার ছকে ফেলে তাকে চরিত্রবান করায় এক ধরনের দার্শনিক মন হয়তো তৃপ্তিলাভ করতে পারে, কিন্তু খাঁটি সাহিত্যিকের চোখে সে চেষ্টা মূঢ়তা ছাড়া কিছু নয়। এ মূঢ়তা যতক্ষণ পর্যন্ত দর্শনের পাতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তা শুধু কৌতুকাবহ। কিন্তু যখন তা দর্শন ছেড়ে সামাজিক জীবনে প্রয়োগের আকার নেয়, তখন সে কৌতুক বড় মর্মান্তিক হয়ে ওঠে।

সাহিত্যিক মানুষের সমগ্র অথচ অসম্পূর্ণ রূপটিকে তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। আগে হতেই যদি তাঁর মন কোন এক নির্দিষ্ট চারিত্রের ছকে বাঁধা পড়ে তবে তিনি এ চেষ্টা করবেন কি ক'রে?

তাঁর সেই উন্মুক্ত, উন্মুখ সহানুভূতিশীলতা থাকা দরকার, যার গুণে তিনি বিচিত্রপ্রকৃতির স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে প্রকৃত আত্মীয়তা অর্জন করতে পারেন। একই সঙ্গে ওথেলো এবং ইয়াগোর অন্তরঙ্গ হতে পারেন ব'লেই না শেক্‌স্‌পীয়র বড় সাহিত্যিক; বুড়ো লীয়র এবং কিশোরী ওফেলিয়া উভয়েই তাঁর সহানুভূতিতে সমান অংশীদার। গ্যয়টে যদি ফাউস্ট, মেফিস্টোফেলেস এবং মার্গারেটা তিনজনের সঙ্গেই একাত্ম না হতে পারতেন, তবে কে তাঁকে মহাকবি ব'লে স্বীকার করত? সাহিত্যিক শাস্ত্রপ্রণেতা নন, তিনি মানবতন্ত্রী।

অতঃপর সত্য সম্বন্ধে প্লেটোর ধারণার কথা ধরা যাক। প্লেটোর দর্শনে সত্য বিমূর্ত (abstract) কল্পনা। এ কল্পনা নিত্য, অজর, অব্রণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে আমরা যা কিছু দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকটিরই নাকি একটি আদি শাশ্বত রূপ আছে। এ রূপ অতীন্দ্রিয়, এর নিবাস পরিবর্তনশীল ভৌতিক জগতের বাইরে। পৃথিবীতে নানা জাতের পশুপাখী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি চোখে পড়ে। প্লেটোর মতে আসলে এরা সত্য নয়। প্রতি জাতের পশুর (যেমন ঘোড়া কি গরু) একটা আদর্শ রূপ আছে। জগতে আমরা যে সেই জাতের নানা পশু দেখি তারা এই আদর্শের অনুকরণ বা ছায়ামাত্র। অনুকরণে শুধু যে নানা ত্রুটি থাকে তাই নয়, অনুকরণ মাত্রই অস্থায়ী। শুধু আদর্শ রূপটিই চিরস্থায়ী এবং ত্রুটিহীন। মানুষের ক্ষেত্রেও তেমনি কতকগুলি মূল আদর্শ রূপ আছে। পার্থিব ব্যক্তি-মানুষেরা এই সব রূপের ভঙ্গুর বিকৃত অনুকরণ মাত্র। শিল্পী সাহিত্যিকেরা আবার এই অনুকরণের অনুকরণ ক'রে তাঁদের শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি করেন। শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি তাই আদি সত্যের শুধু বিকার নয়, বিকারেরও বিকার। সত্যসন্ধিৎসু দার্শনিকের কাছে সাহিত্য নিতান্তই মূল্যহীন। অথবা শুধু মূল্যহীন নয়, মারাত্মক ভ্রমের আকর হিসেবে বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

সত্য সম্বন্ধে প্লেটোর এই ধারণা কতখানি সত্য? প্রায় দু হাজার বছর আগে পাইলেট "সত্য কি?" প্রশ্ন করেছিলেন। আজ পর্যন্ত সে প্রশ্নের এমন কোন জবাব মেলে নি, যার যাথার্থ্য অন্তত দার্শনিকের কাছে সন্দেহাতীত। কিন্তু এই জবাব না মেলার মধ্যেই কি প্লেটোনিক ভ্রান্তির হদিস মেলে না? সত্য জ্ঞানের উপাদান এবং শেষ পর্যন্ত সব জ্ঞানই ইন্দ্রিয়নির্ভর। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার ওপরে বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটলে তবেই জ্ঞানের উদ্ভব সম্ভবপর হয়। নিজের এবং পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ ক'রে তবেই না প্লেটো আদর্শ রূপের কল্পনা করেছিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যদি একটিও ঘোড়া না থাকত, তা হ'লে কেউ কি আদর্শ ঘোড়া কল্পনা করতে পারত? যদি বলা হয়, এমন অনেক কল্পনা আছে যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিরূপ জগতে দেখা যায় না, তবে সে ক্ষেত্রেও বিশ্লেষণ করলে চোখে পড়বে এ সব কল্পনার উপাদান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হতে সংগৃহীত। পাখী এবং ঘোড়া দুই-ই আছে ব'লে তবেই না আমরা পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা ভাবতে পেরেছি। এমন কি জ্যামিতি বা গণিতের আপাতদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ কল্পনাও পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা হতে উদ্ভূত।

আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়নির্ভর ব'লে সে জ্ঞানে কখনো সম্পূর্ণতা আসতে পারে না। আমরা বহু স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার তুলনা বিশ্লেষণ ক'রে তবে একটি ধারণায় পৌঁছই। এবং এ জগৎ বাস্তবিকই অনন্ত হোক বা না হোক, আমাদের মানসিক সামর্থ্যের হিসেবে তার অন্ত অকল্পনীয়। তা যে শুধু ব্যাপ্তিতে বিশাল তাই নয়, সময়ের দিক হতে বিচার করলে অতীত ঘটনার আমরা কতটুকুই বা জানি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রায় কিছুই তো জানি না। তা ছাড়া প্রতি বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনার অগণিত দিক আছে। ফলে অভিজ্ঞতার ওপরে নির্ভর ক'রে আমরা যে সব ধারণা গ'ড়ে তুলি, তাদের অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। অথচ অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন পথে ধারণা গ'ড়ে ওঠা সম্ভব নয়। কেননা যে সব ধারণা

আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করি, সেগুলিও আসলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে একদা গ'ড়ে উঠেছিল। তবে জ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর ব'লে এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে ধারণা মাত্রই মায়া বা মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান মানুষের অনায়ত্ত, কেননা ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব কল্পনা। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য মানুষের আয়ত্তিসাধ্য। এক দিকে ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতির দিক হতে মানুষের অভিজ্ঞতা যত সমৃদ্ধি অর্জন করে এবং অন্য দিকে সে অভিজ্ঞতার তুলনাবিশ্লেষণের উপায়পদ্ধতি যত সূক্ষ্ম এবং নিপুণতর হয়, ততই জগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এবং সিদ্ধান্তে অধিকতর যাথার্থ্য এবং নির্ভরযোগ্যতা আসে। মানুষের জ্ঞান নিত্য নয়, তা বিকাশধর্মী।

এখন সাহিত্যিক প্লেটোনিক অর্থে সত্যসন্ধ নন। পূর্বকল্পিত কোন আদর্শ মানুষের কাহিনী রচনায় তাঁর কল্পনা স্ফূর্তি পায় না। স্থূল দেহ-বিশিষ্ট ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই তিনি মানবীয় সত্যেব অনুসন্ধান করেন। প্রতি মানুষই তাঁর কাছে অফুরন্ত রহস্যের আধার। তিনি ব্যক্তির চেতন, প্রাক্‌চেতন এবং অপরিস্ফুটচেতন সমগ্র রূপটি বোঝবার চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে প্রতি ব্যক্তি এক ধারে অনন্য, অন্য ধাবে সব মানুষের প্রতিভূ। অন্য সব সত্যসন্ধানীদের মত তাঁর অন্বেষণও অসম্পূর্ণ। সব দেশের সব কালের সব মানুষের খবর রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর কোন একটি মানুষেব সবখানি খবর কে-ই বা কবে জেনেছে। তবু এখানেও জানার কম-বেশি আছে। যে সাহিত্যিক মানুষ সম্বন্ধে যত বেশী অনুসন্ধান-তৎপর, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি তত বেশী মূল্যবান হবার সম্ভাবনা। চসার তাই ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের চাইতে অনেক বড় কবি; টলস্টয়ের পাশে উগোর উপন্যাস তাই জোলো ঠেকে। এই অর্থে সাহিত্যের সাধনাও সত্যের সাধনা। এ সত্য প্লেটোনিক দর্শনের অবাস্তব ব্রহ্মসত্য নয়। এ সত্য অভিজ্ঞতানির্ভর বিবর্তনশীল আপেক্ষিক মানব সত্য।

দুই

পূর্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে, আদর্শ-রাষ্ট্রে সাহিত্যের স্থান বিষয়ে প্লেটোর সিদ্ধান্ত শুধু সাহিত্য-বিশ্লেষণের দ্বারা নিরূপিত হয় নি ; সে সিদ্ধান্ত মুখ্যত দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। তাঁর দর্শনে সত্য, ন্যায় বা চারিত্রের যে ব্যাখ্যা, তা মেনে নিলে সাহিত্যিককে সত্যসন্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ কি চরিত্রবান বলা চলে না। প্লেটোর সিদ্ধান্তে যদি আমরা সায় দিতে না পারি তবে তার কারণ, প্লেটোর দার্শনিক প্রত্যয়গুলি আমাদের কাছে যথার্থ ঠেকে না। উল্টে আমাদের মনে হয়, প্লেটোর এই প্রত্যয়গুলি ভ্রান্ত এবং এ-জাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা পরিচালিত চিন্তা এবং ব্যবহার মানুষের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। কোন সৎ সাহিত্যিকের মন যে এ-জাতীয় প্রত্যয়ে আরাম পায় না সাহিত্য সম্বন্ধে এটা মস্ত বড় ভরসার কথা ; এবং আমাদের ধারণা, সাহিত্যিকেরা প্লেটোনিক অর্থে চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ কি সত্যসন্ধ নন ব'লেই মানুষের কাছে সাহিত্যের দাম এত বেশী।

কথাটা প্রথম নজরে ধৃষ্টতার মত মনে হতে পারে ; সুতরাং এ বিষয়ে হয়তো আর একটু বিশদ হবার প্রয়োজন আছে। জানবার ইচ্ছা যেমন মানুষের একটা মূল সহজাত বৃত্তি, মানবার প্রবণতা তেমনি মানুষের একটা সামান্য লক্ষণ। এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট ; কিন্তু জীবদেহে স্থিতিস্থাপকতার সামর্থ্য অনেকখানি ব'লে মানবপ্রকৃতিতে অন্য পাঁচটা বিরোধের মত এ বিরোধও সব সময়ে আত্মঘাতী সংঘাতরূপে দেখা দেয় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ বিরোধ মানুষের চিন্তায় এবং জীবনে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল আমরা জানি না। যখন থেকে মানুষের ভাবনা উত্তরকালের মানুষদের বোধ্য রূপ নিতে শুরু করেছে, তখন থেকে আমরা সভ্যতার ইতিহাসে এই মৌল বিরোধের বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাসমষ্টির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে

কিছু বুদ্ধিমান কল্পনাশীল মানুষ কতকগুলো সামান্য ধারণা এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; তারপর সেই সব ধারণা-সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর ক'রে জীবন-পরিচালনার প্রয়োজনে তারা সেই আংশিক জ্ঞানে পূর্ণতা আরোপ করে। তাদের তারা নিত্যসত্য ব'লে মানে এবং নানা প্রকরণপদ্ধতির সাহায্যে আপন আপন গোষ্ঠীর বাকী মানুষদের মানায়। মানুষী বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাই যে এসব প্রত্যয়ের একমাত্র উৎস, এ কথা জানতে পারলে পাছে অন্য মানুষেরা তাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে, তাই তারা সেসব প্রত্যয়কে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির নির্দেশ ব'লে চালাবার চেষ্টা করে। অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণার ওপরে মেকী ব্রহ্মজ্ঞানের তক্‌মা চাপিয়ে আরোহী বুদ্ধির মনে সন্ত্রাস জাগাবার চেষ্টা সভ্যতার ইতিহাসে অতি প্রাচীন ও পৌনঃপুনিক ঘটনা। এই তক্‌মা যার প্রতীক, তার সম্বন্ধে বেশী প্রশ্ন করলে ধড় হতে মুণ্ডুটি খ'সে পড়তে পারে—প্রাচীন ভারতের এক তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি একদিন এ-জাতীয় ভয় দেখাতে কুণ্ঠিত হন নি। মুশা হতে মহম্মদ, যাজ্ঞবল্ক্য হতে যীশু, স্রেফ মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে এঁরা কেউই নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করেন নি। এঁরা কেউ বা ব্রহ্মজ্ঞানী, কেউ বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ, আবার কেউবা খোদ ঈশ্বরের সন্তান।

কিন্তু আংশিক জ্ঞানকে আপ্তবাক্য ব'লে মেনে নেওয়াই যদি মানুষের একমাত্র বৃত্তি হ'ত, তা হ'লে দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সমাজ-প্রতিষ্ঠান, এক কথায় মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন বিকাশ সম্ভব হ'ত না। মানুষ যেমন আংশিক ধারণাকে ব্রহ্মসত্য ব'লে মেনেছে এবং মানিয়েছে, তেমনি তারই সঙ্গে সে ধারণার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়ী হয়েছে। সে ধারণাকে নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চেয়েছে। তার জন্যে তাকে দাম দিতে হয়েছে বিস্তর—বিশ্বাসের বাড়া শান্তি নেই, আর অবিশ্বাসের বাড়া অশান্তি নেই,—তবু দাম দিতে সে গররাজী হয় নি ব'লেই মানুষের জ্ঞান পারমেনিদেস,

কুংফুৎসে কি মনুতে এসে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। মানুষের জিজ্ঞাসু বুদ্ধি তাকে বার বার স্বনির্মিত সংস্কারের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করেছে। শুধু যে প্রোটাগোরাস, চুয়াঙ্‌ৎসু, চার্বাক কি এরাসমুসের মত মুক্তবুদ্ধি দার্শনিকেরাই মানসিক জাড্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তা নয়, সংস্কারবদ্ধ সাধারণ মানুষদের মনেও তাদের সহজাত যুক্তিবৃত্তি নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাড়নায় সক্রিয় হয়ে উঠে অভ্যস্ত ভাবনা-ধারণা সম্বন্ধে তাদের সংশয়ী ক'রে তুলেছে। বস্তুত সত্যসন্ধিৎসা মানবপ্রকৃতির অন্যতম মূলবৃত্তি, এবং এ বৃত্তি যে-মানুষদের সাধনার মধ্যে সব চাইতে সার্থকতা লাভ করে সাহিত্যিক তাঁদেরই একজন। প্রচলিত সংস্কারের ঐতিহ্যে আর পাঁচটা মানুষের মত সাহিত্যিকেরও বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক মন তাঁকে এ ঐতিহ্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেয় না। ধারণার চাইতে অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে বেশী মূল্যবান, বিমূর্ত আদর্শের চাইতে বাস্তব বিষয়ে তিনি অধিকতর কৌতূহলী। প্রচলিত ধারণা যে কত অসম্পূর্ণ, তার নিত্যতার দাবি যে কত ভিত্তিহীন, জীবন সম্বন্ধে তাঁর তীব্র অনুভূতিশীলতা সে বিষয়ে তাঁকে ক্রমেই সজাগ ক'রে তোলে। দার্শনিকের মত সচেতন ভাবে তিনি হয়তো এসব ধারণার বিচার করতে বসেন না; কিন্তু তাঁর শাণিত জীবনবোধের স্পর্শে এদের মেকী ব্রহ্মত্ব সহজেই খ'সে পড়ে। বোকাচ্চিও, রাবেলে, শেক্সপীয়র, সার্ভান্তেস, গ্যয়টে, ইবসেনের মত সত্যসন্ধ পুরুষ ইয়োরোপের ইতিহাসে ক'জন চোখে পড়ে! এঁরা আমাদের কোন নিটোল, নীরন্ধ্র ব্রহ্মতত্ত্বের হদিস দিয়ে যান নি; কিন্তু আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করেছেন, বোধকে সূক্ষ্মতর করেছেন, চলতি ধারণার ঠুলি খসিয়ে মানুষের জটিল রহস্যময় অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। এ কাজ এঁরা করতে পেরেছেন তার কারণ, প্লেটোনিক আদর্শরূপের ধ্যান এঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। পার্থিবকে অপার্থিব, পরিবর্তনশীলকে নিত্য, জটিলকে সরল, বহুকে এক, উন্মুক্তকে গণ্ডীবদ্ধ কল্পনা ক'রে নিজেদের ব্রহ্মাস্ত ব'লে

জাহির করতে এঁদের বেধেছে। এঁদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, আপেক্ষিক, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সত্যবিমুখ নয়। মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার ইতিহাসে তাই শঙ্কর কি টমাস অক্যানাসের চাইতে শেক্সপীয়র ও টমাস মানের দান অনেক বেশী।

যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ন্যায় এবং চারিত্রের ক্ষেত্রেও সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী সমানভাবেই সত্যসন্ধ, সংস্কারমুক্ত এবং ফলপ্রসূ। সাহিত্যিকের কাছে সমাজ বা শাস্ত্র-নির্দেশের চাইতে ব্যক্তি-মানুষ বেশি মূল্যবান। এখানে প্লেটোনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক মনোভাবের বিরোধ অতি সুস্পষ্ট। সব মানুষই একধারে যেমন মানুষ, অন্যধারে তেমনি প্রতি মানুষই অপর মানুষ হতে স্বতন্ত্র। তার প্রাতিস্বিক সমগ্রতায় সে অনন্য; সেখানে সে সকল সমীকরণের ঊর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ সমাজে বাস করে, আর ব্যক্তির অনন্যতার ওপরে ভিত্তি ক'রে সমাজ গড়া শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় একেবারেই অসম্ভব। পাঁচজন শুধু একত্র হ'লেই সমাজ হয় না; পাঁচজনের আচার-ব্যবহার, ভাবনা-চিন্তা একই বিধিব্যবস্থা, একই নীতিনির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'লে তবেই সমাজ সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তি তার অনন্যতার দাবিকে কিছু পরিমাণে খর্ব না করা পর্যন্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠতে পারে না। সেই সমাজই আদর্শ সমাজ যেখানে সামাজিকতার প্রয়োজনে ব্যক্তিত্বের সঙ্কোচন সব চাইতে কম, যেখানে সহযোগিতার ফলে প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিবর্ধমান। কিন্তু এতাবৎ অধিকাংশ সমাজেই ব্যক্তির অনন্যতাকে যতদূর সম্ভব খর্ব ক'রে সামাজিক সামান্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা সংখ্যার গুরুত্বে সমাজ ব্যক্তির চাইতে প্রবল। ফলে ক্রমে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়, যেখানে সমাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশের মাধ্যম না হয়ে তার আত্মবিলোপের যন্ত্র হয়ে

ওঠে। ব্যক্তি তার নিজের স্বভাবকে অস্বীকার ক'রে সমাজনির্দিষ্ট ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করার মধ্যে পরমার্থ খোঁজে। তার আচার-ব্যবহার, ভাবনা-চিন্তা, প্রত্যয়-প্রচেষ্টা এমন কি আবেগ-অনুভূতি পর্যন্ত সামাজিক বিধি-নিষেধের দ্বারা নিরূপিত হতে থাকে। সে তখন আর ব্যক্তি নয়, সে তখন সমষ্টির অংশমাত্র। তার মধ্যে যেটুকু অনন্যতাবোধ এ অবস্থাতেও টিকে থাকে, তা নিয়ে তার মহালজ্জা। গড্ডলবৃত্তিই তখন তার বিবেকের মুখ্য অবলম্বন, সামাজিক বিধির অনুবর্তন তখন তার জীবনের মূল নীতি। এ অবস্থায় কি ব্যক্তি কি সমাজ দুয়ের মধ্যেই যে বিকাশের সম্ভাবনা দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসবে—এ আর বিচিত্র কি! মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় সমাজে মনুষ্যত্বের বিকাশ একদিন এই ভাবেই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। দূর দেশের কথা দূরে থাক্, এ দেশের হিন্দু এবং মুসলমান সমাজেও কি দীর্ঘদিন ধ'রে আমরা এই মূঢ়তার আত্মঘাতী প্রভাব দেখে আসছি না?

এ মূঢ়তা হতে সাহিত্য বার বার মানুষকে উদ্ধার করে এসেছে। কেননা যদিচ ভাষা ছাড়া সাহিত্য সম্ভব নয় এবং ভাষা সমাজেরই সৃষ্টি, তবু ব্যক্তিমানুষের অনন্যতাকে অবলম্বন ক'রেই চিরদিন সাহিত্যকল্পনা স্ফূর্তি লাভ করে। সমাজের প্রভাবে আমরা বার বার প্রতি মানুষের অনন্য সমগ্র রূপটিকে ভুলতে বসি, এবং সাহিত্যিক বার বার সেই রূপটি সম্বন্ধে আমাদের বোধকে জাগ্রত করেন। মানুষ যে শুধু সামাজিক জীব নয়, কোন পূর্বকল্পিত আদর্শের ছাঁচে যে তার সবখানি অস্তিত্বকে ধরানো যায় না, সে যে অনন্য, তার মধ্যে যে অগণিত সম্ভাবনা বিকাশের জন্যে অপেক্ষমান —এ চেতনা সব সৎ সাহিত্যের কেন্দ্রে সক্রিয়। ব্যক্তির অনন্যতার স্বাদ না দিতে পারা পর্যন্ত ভাষা সাহিত্যের ব্যঞ্জনা অর্জন করে না। লিরিক কবিতা, গাথাকাহিনী, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প,

এমন কি সাহিত্যপদবাচ্য প্রবন্ধের মধ্যেও অনন্য ব্যক্তি-মানসের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সামাজিক লঘুকরণের অন্তরালে ব্যক্তির যে জটিল, রহস্যময়, অমেয় অস্তিত্ব বর্তমান, সাহিত্যিকের মানবতাবোধ এবং সত্যসন্ধিৎসা তাকে বুঝতে এবং ভাষার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চায়। ইলিয়ড-অডিসি কিম্বা রামায়ণ-মহাভারতের মানুষ-মানুষী, দেব-দেবী, রাক্ষস-বানর, মায়াবিনী-কুহকিনীরা সমাজকল্পিত টাইপ নয়। তা যদি হ'ত, ওসব বই পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় হয়েই থাকত, সাধারণ মানুষদের মনে যুগ যুগ ধ'রে সাড়া তুলত না। মহাকাব্যের এইসব চরিত্র বিচিত্র ব্যক্তি-মানুষের স্বাদে সরস ব'লেই তারা আজও আমাদের মনে সংবেদনার সঞ্চার করে। তারা প্রত্যেকেই জটিল, অনন্য, রহস্যময়—কোনো ঔচিত্যের ছাঁচে তাদের গড়া হয় নি। দান্তের মহাকাব্য এক ভক্ত ক্যাথলিকেরা ছাড়া কেই-বা পড়ত, যদি না তাঁর নরকের স্তরে স্তরে অসংখ্য ব্যক্তি-মানুষের বিচিত্র মুখ উঁকি মারত। আর কি রহস্যময়, কি ইঙ্গিতপূর্ণ সে সব মুখ! এক লেওনার্দোর স্কেচ এবং কখনো বা ডুয়েরের-এব ড্রইং-এর মধ্যে ছাড়া কোথায় তার তুলনা আছে? ওই একই গুণে সমৃদ্ধ না হ'লে 'ক্যান্টরবেরী টেল্‌স্' কি অমর সাহিত্যের কোঠায় পড়ত? লিরিক-কবিদের রচনায় অবশ্য বহু চরিত্রের স্বাদ থাকে না; তাঁরা মুখ্যত নিজেদের কথাই লিখে থাকেন। কিন্তু সেখানেও তাঁরা যা ফুটিয়ে তোলেন তা কোন শাস্ত্রনির্দেশের ছাঁচে-ঢালা ব্যক্তিচরিত্র নয়; তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে জটিল বহুমুখীনতা আছে, নানাভাবে তারই নানা দিক নির্মোহ সততায় ফুটিয়ে তুলতে পারলে তবেই তাঁরা যথার্থ লিরিক-কবি। কাটুল্লুস কি লিপো কি ডান কি হাইনে কি ব্যদলেয়র কি র‍্যাঁবোর কবিতায় ওই ওই কবির অনন্য ব্যক্তিত্বের বিচিত্র দিক প্রকাশিত, উদ্ঘাটিত হয়েছে ব'লেই না তাঁরা দেশকালের ব্যবধান পেরিয়ে সব দেশের রসিকদের আত্মীয়তা অর্জন করেছেন।

ব্যক্তি বিষয়ে এই অনন্যচিত্ত কৌতূহল নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্পের

ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট—এখানে তার প্রকাশ আরও বিচিত্র। ইউরি-পিদেস্, শেক্সপীয়র, ইবসেন্ কি ও'নীল-এর চরিত্রেরা সামাজিক টাইপ নয়, তারা প্রত্যেকেই অনন্য ব্যক্তি। শুধু তাই নয়; ন্যায় বা ঔচিত্যের সংস্কারার্জিত গজকাঠি দিয়ে তাদের মাপতে গেলে শুরু-শেষের হদিস মেলে না। সামাজিক রীতিনীতি, আচারব্যবহারে অভ্যস্ত আমাদের মন বার বার এ কথা ভুলে যায় যে, ব্যক্তি মাত্রই মূল্যবান এবং অদ্বিতীয়, প্রতি মানুষের মধ্যে এমন সব গূঢ় সম্ভাবনা বর্তমান যা অনির্দেশ্য, যাকে কোন হিসেবের ছকে ফেলা যায় না। শুধু ভুলি না, ব্যবহারিক জীবনে এই অনন্যতার আভাস পেলে আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠি; হয় তাকে এড়াতে চাই, নয় তার শাস্তিবিধান করি। অথচ ওই গূঢ় অনির্দেশ্যতা আছে ব'লেই মানুষের ইতিহাস অন্য সব জীব-জন্তুর ইতিহাসের তুলনায় এত সমৃদ্ধ, এত বিচিত্র। সমাজ শুধু মানুষে মানুষে ব্যবহারিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে। সাহিত্য তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানবতাবোধের সামর্থ্যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ ক'রে তোলে। সাহিত্যপাঠের ফলে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের বোধ সূক্ষ্মতর হয়; এক ধারে আমাদের নিজেদের মন যেমন সরস সজাগ এবং সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, অন্য ধারে তেমনি অপরের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা সহজতর হয়। টলস্টয় কি ডস্টয়েভ্স্কির উপন্যাস, ক্যাথারিন ম্যানস্ফিল্ড কি রবি ঠাকুরের গল্প পড়ার পর মানুষকে আমরা নতুন ক'রে বুঝতে শিখি। ব্যক্তি যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র নয় (তা সে উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না কেন), সে যে স্বয়ংসিদ্ধ এবং সে কারণে মূল্যবান—সব মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির কেন্দ্রে এই মানবতন্ত্রী প্রত্যয় সক্রিয়। মানুষের যেটা পরিবেশনিরূপিত বাইরের রূপ, যার চরম উৎকর্ষের নাম চারিত্র—সমাজ আমাদের শুধু তারই হদিস দিতে পারে। কিন্তু যাকে আমরা ব্যক্তিত্ব বলি, ব্যক্তির চেতন, অচেতন, অবচেতন, জানা-অজানা, পরিবর্তনশীল

অস্তিত্বের বিচিত্র সেই যে প্রাতিস্বিক সমগ্রতা—সে বিষয়ে জানতে হ'লে সাহিত্যিকের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আর এই জানাই হ'ল যথার্থ নীতিবোধের মূল উৎস। যে ন্যায় মানুষকে শুধু খণ্ডিত খর্বিত করতেই জানে, যে বিবেক শুধু নিগ্রহেই পরিতৃপ্তি পায়, যে নীতিতত্ত্ব মানুষের বাহ্যিক ব্যবহারিক রূপের আড়ালে তার জটিল পরিবর্তনশীল সমগ্র অস্তিত্বের স্বীকারে পরাঙ্মুখ, তা শুধু অনুপযোগী নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশে তা একটা মস্তবড় বাধা। এ বাধা-অপসারণে সাহিত্যের দান অবিস্মরণীয়। সাহিত্যিকের কাছ হতে আমরা আপনাকে এবং অপরকে ব্যক্তিহিসেবে মূল্য দিতে শিখি, শিখি যে ব্যক্তির বিকাশই সব নৈতিক মূল্যায়নের উৎস এবং মানদণ্ড, শিখি যে ব্যক্তি তার কর্মের চাইতে বড়, আর তাই শুধু বাইরের ব্যবহার দিয়ে কোন মানুষের বিচার করা মূঢ়তা মাত্র। সাহিত্যিক অবশ্য কোন নীতিকথার মাধ্যমে এ শিক্ষা দেন না; সাহিত্যপাঠজাত কৌতূহল এবং সংবেদনা পাঠককে নিগূঢ়ভাবে এই শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলে। জ্ঞানের দিক হতে যেমন মনুষ্যত্ব বিকাশের দিক হতে তেমনি, সাহিত্যিক-দের দান তাই শাস্ত্রকারদের চাইতে বেশী মূল্যবান।

তিন

এতাবৎ কাব্য তথা সাহিত্য বিষয়ে প্লেটোর তৃতীয় দফা অভিযোগের আমরা আলোচনা করি নি। কাব্যের উৎস প্রেরণা এবং প্লেটোর মতে কোন ব্যক্তির মনে যতক্ষণ পর্যন্ত এতটুকু যুক্তিক্ষমতা সক্রিয় থাকে ততক্ষণ তার পক্ষে অনুপ্রেরিত হওয়া অসম্ভব। সত্য এবং ন্যায়নিষ্ঠার মত প্রেরণা কথাটিরও প্লেটোনিক দর্শনে একটি বিশেষ অর্থ আছে। এ অর্থ তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়, তৎকাল-প্রচলিত হেলেনীয় সংস্কার হতে পাওয়া। গ্রীকভাষায় প্রেরণার যেটি প্রতিশব্দ—entheos, যা হতে ইংরেজী এনথুজিয়াজম্-এর উদ্ভব—তার সোজা মানে হ'ল দেবতায়

পাওয়া। আমরা যেমন বলি—অমুকের ভর হয়েছে, গ্রীকরাও তেমনি বিশ্বাস করত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ মানুষদের ওপরে দেবতার ভর হয়। তখন তারা আর নিজেদের বশে থাকে না; যুক্তিবহির্ভূত অলৌকিক শক্তিদের হাতের যন্ত্রে পর্যবসিত হয়। তাদের বুদ্ধিবিবেক তখন একেবারে মোহগ্রস্ত, সত্যমিথ্যা-ভালমন্দ বিভেদ করার শক্তি তখন সাময়িকভাবে লুপ্ত, তখন তারা কি যে বলছে কি যে করছে তা তারা নিজেরাই জানে না। আজকের দিনের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নরনারীর মত সেদিনের গ্রীক জনসাধারণও এ-জাতীয় প্রেরণাকে দৈবানুগ্রহ মনে ক'রে এইসব দেবতায়-পাওয়া মানুষদের কাছে আপ্ত-বাণীর খোঁজ করত। সে বাণীর কোন মাথামুণ্ডু থাক্ বা না থাক্, তবু তা স্বতঃসিদ্ধ, কেননা তাব উৎস ভ্রান্তিশীল মানুষ নয়, তার উৎস স্বয়ং দেব-গোষ্ঠী।

প্লেটোর মতে পূর্বোক্ত অর্থে কবিরা অনুপ্রেরিত জীব। প্লেটোর পূর্বে কবি পিণ্ডারও কাব্যপ্রেরণা সম্বন্ধে এ ধরনের উক্তি করেছিলেন। প্লেটো আরও বিশদভাবে এ তত্ত্ব তাঁর নানা রচনায় গুরু সক্রেটীসের জবানীতে ব্যাখ্যা করেছেন। 'আয়ন' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, মহৎ কাব্যের রচয়িতারা যে কোন যুক্তিসম্মত বিধি-নিয়মের বা আর্টের চর্চা ক'রে তাঁদের কল্পনায় মহত্ত্ব অর্জন করেন তা নয়; তাঁদের সে মহত্ত্ব দৈবসূত্রে পাওয়া; কাব্যরচনার সময় তাঁরা অলৌকিক শক্তিদের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি আরও বলেছেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ লোপ না ঘটলে, দেবমন্দিরের নর্তকদের মত বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ না হারাতে পারলে, এক কথায় একেবারে উন্মাদের দশায় না পৌঁছতে পারলে, যথার্থ কবি হওয়া অসম্ভব। শুধু তাই নয়, কাব্যপ্রেরণার প্রভাব চুম্বকের মত; তিনিই সার্থক কবি যাঁর কাব্য স্থানকালনির্বিশেষে আবৃত্তিকারের পর আবৃত্তিকারকে, শ্রোতার পর শ্রোতাকে, মূল প্রেরণার চৌম্বক প্রভাবে আত্মবোধহীন উন্মাদে পর্যবসিত করতে পারে।

সুতরাং কাব্য হতে আমরা যা পেতে পারি তা জ্ঞান নয়, তা উন্মাদনা ; কেননা, জ্ঞান যুক্তিনির্ভর, অপরপক্ষে যুক্তির লেশমাত্র বজায় থাকা পর্যন্ত না সম্ভব কাব্যসৃষ্টি, না কাব্যসম্ভোগ।

এই যদি কাব্যপ্রেরণার চরিত্র হয় তবে নিয়মনিয়ন্ত্রিত ন্যায়রাষ্ট্রে কবিদের কি ক'রে স্থান হতে পারে? কবিরা কি দার্শনিক কি ব্যবহারিক কোন জ্ঞান দিতেই অক্ষম ; তাঁরা ঔচিত্যের নির্দেশ মানতে অনিচ্ছুক ; আর সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা যে-ক্ষমতার জোরে তাঁরা কবি, সে ক্ষমতা অনতিক্রমণীয় ভাবে যুক্তিবিরোধী এবং সে কারণে তার নিয়ন্ত্রণ একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। প্লেটোর প্রথম যুগের রচনায় কাব্যপ্রেরণা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিরোধ চোখে পড়ে। কবিরা জ্ঞানমার্গের সাধক নন ; তাঁদের ভাবনা ব্যবহার ন্যায়নিষ্ঠার দ্বারা সংস্কৃত নয় ; তবু অনুপ্রেরিত অবস্থায় তারা দৈবশক্তির অধিকারী। প্রেরণার বলে তাঁরা অলৌকিক জগতের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন। এ কারণে প্রেরণাকে যুক্তিবিরোধী এবং অনিয়ন্ত্রণীয় বলা সত্ত্বেও প্লেটো গোড়ার দিকে ব্যতিক্রম হিসেবে তার যে একটা বিশেষ মূল্য আছে তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে কাব্যপ্রেরণার এই বিশেষ মূল্যকে তিনি তাঁর দর্শনচিন্তায় তেমন আমল দেন নি। ব্রহ্মসত্যের অপরোক্ষানুভূতি তখনও তাঁর কাছে মূল্যবান ছিল ; কিন্তু সে দুর্লভ অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ তখন আর প্রেরণা নয়, ক্ষুরধার ডায়ালেক্‌টিকের সুকঠিন সংযমেই তার প্রস্তুতি। বস্তুত আথেনীয় গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা ক্রমেই প্লেটোর মনে এ প্রত্যয় দৃঢ়মূল করেছিল যে, প্রতিটি স্ত্রীপুরুষের চিন্তা, ব্যবহার, এক কথায় চরিত্র, যতক্ষণ না কর্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ততক্ষণ মানবসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুতরাং যা কিছু এই নিয়ন্ত্রণের প্রতিবন্ধক তার সমূল উৎপাটন অবশ্যকর্তব্য। প্লেটোর পরিণতকালের চিন্তাধারায় তাই এ যুগের সাবিক (totali-

tarian) সমাজাদর্শ এবং শাসনপদ্ধতির পূর্বাভাস চোখে পড়ে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে প্রতি ব্যক্তির চরিত্র ও আচার-ব্যবহার পূর্বপরিকল্পিত এবং নীতিনির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু যাঁরা প্রেরণার দাস, আদর্শ রাষ্ট্রের দার্শনিক শাসনকর্তারা তাঁদের চরিত্র এবং ব্যবহার কি ক'রে নির্দিষ্ট করবেন? 'রিপব্লিক্-এর গোড়ার দিকে সক্রেটীসের মুখ দিয়ে প্লেটো অবশ্য বলেছেন যে, কবিরা রাষ্ট্রপরিচালকদের নির্দেশ অনুযায়ী শুধু নীতিসঙ্গত কথা লিখবেন—এ প্রতিশ্রুতি দিলে রাষ্ট্র তাঁদের পোষণ এবং সমর্থন করবে। কিন্তু কবিরা এ প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পালন করার সামর্থ্য তো তাঁদের নেই। কেননা, প্রেরণার বশ তাঁরা যে কি লিখবেন কি বলবেন তা তো আগে হতে তাঁরা নিজেরাও জানেন না। ফলে 'রিপব্লিকে'র শেষ অধ্যায়ে প্লেটো রায় দিলেন যে, আদর্শ রাষ্ট্রের চৌহদ্দী হতে কবিদের খেদানো ছাড়া উপায় নেই। "কেননা, প্রিয় গ্লৌকন, যদিও জনসাধারণ সে কথা পুরো বোঝে না, তবু মানুষের সৎ হওয়া কি অসৎ হওয়ার ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করছে এবং সে কারণে কি খ্যাতি, কি বিত্ত, কি পদমর্যাদা, কি কাব্য কোন কিছুর সম্মোহনেই ন্যায় এবং অন্যান্য নৈতিক আদর্শকে কিছুতে অবহেলা করা চলবে না।" অতএব দার্শনিকের রাষ্ট্র থেকে কাব্যলক্ষ্মীকে, যত বিষণ্ণ-চিত্তেই হোক, শেষ পর্যন্ত বিদায় দিতে হ'ল।

কিম্বদন্তী অনুসারে প্লেটো প্রথম যৌবনে কবি ছিলেন। গুরু সক্রেটীসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে সব কবিতা নাকি তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। গ্রীক কাব্যসঙ্কলনে তাঁর লেখা ব'লে প্রচলিত কিছু কিছু টুকরো কবিতাও পাওয়া যায়। এ কিম্বদন্তী সত্য কি না, এসব কবিতা যথার্থই প্লেটোর রচনা কি না, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, তাঁর নানা দার্শনিক রচনা হতে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, এই ঘোর কাব্যবিরোধী

দার্শনিক প্রকৃতির দিক থেকে অনেকখানিই কবিদের সমধর্মী ছিলেন। ফলে কাব্যপ্রেরণা বিষয়ে তাঁর বিবরণে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ পাওয়া যায়। দেবতায়-পাওয়া ইত্যাদি আদিম ধারণা-কল্পনা বাদ দিলে এ কথা বোধ হয় সব সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক স্বীকার করবেন যে, সাহিত্যসৃষ্টির মূলে এমন এক শক্তি সক্রিয়, যার ওপরে কোন হুকুম খাটে না। এই শক্তিরই নামকরণ করা হয়েছে প্রেরণা। আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্ররা এ শক্তিকে পর্যন্ত নিজেদের তাঁবেদার করার চেষ্টা করেছে। ফলে যদিও সে সব দেশে বছরে বছরে কেতাব ছাপা হয়েছে বিস্তর, কিন্তু সাহিত্য-প্রেরণা গেছে শুকিয়ে। যাঁরা জাতসাহিত্যিক, তাঁরা হয় দেশ ছেড়েছেন (যেমন টমাস্ মান কি ইভান্ বুনিন), নয় আত্মহত্যা করেছেন (যেমন মায়াকোভস্কী), নয় কারাগারে, দাসশিবিরে কি গ্যাসচেম্বারে প্রাণ দিয়েছেন। তবু অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রশক্তি আজ পর্যন্ত শিল্পীসাহিত্যিকের প্রেরণাকে পুরোপুরি আপন মুঠোয় আনতে সমর্থ হয় নি। এসব অভিজ্ঞতা প্রেরণা বিষয়ে প্লেটোর বিশ্লেষণকে স্পষ্টতই সমর্থন করে।

প্রেরণার উৎস যে কি তা আমরা আজও জানি না; তবে এটুকু আমরা জানি যে, তা শুধু সমাজ এবং রাষ্ট্রের আয়ত্তের বাইরে নয়, শিল্পীসাহিত্যিকের নিজেরও তার ওপরে বিশেষ কোন হাত নেই। এই হাত-না-থাকা দু অর্থে সত্য। অত্যন্ত সংযমী লেখকও যখন ভেতরকার তাগিদে লিখতে বসেন, তখন সে লেখা শেষ পর্যন্ত কি রূপ নিয়ে গ'ড়ে উঠবে আগে হতে সেটা তাঁর পক্ষে নিশ্চিত ক'রে জানা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, সৃষ্টিপ্রেরণা যতক্ষণ সক্রিয় ততক্ষণ তার দাবি অস্বীকার করার সামর্থ্য সে প্রেরণার অধিকারীর নেই। এ দিক হতে শিল্পীসাহিত্যিক প্রেরণার অধিকারী হয়েও প্রেরণার দাস। লেখকের মনে যখন লেখার প্রেরণা আসে তখন তাকে লিখতেই হবে, কাগজ-কলম না পেলে অন্তত

মনে মনে, অন্তত মুখের ভাষায় তার সে প্রেরণাকে প্রকাশ করতে হবে। অন্য শ্রোতা কি পাঠক না থাক্, সে রূপ নিজের কানে শুনতে হবে, নিজের চোখে দেখতে হবে। এ না হওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই, অন্য কাজে মন নেই, অন্য চিন্তার অবসর নেই।

কিন্তু প্রেরণাই তো সাহিত্যের একমাত্র সূত্র নয়। সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যে সুকঠিন সংযমেরও একান্ত প্রয়োজন আছে। প্লেটো এ দিকটা একেবারে অবহেলা করেছেন। শিল্পকর্মের (Ars) অনুশীলন যে সাহিত্যিকের পক্ষে প্রেরণার ((ingenium) চাইতে কম আবশ্যিক নয়, পরবর্তী কালে বৈজন্তীয় এবং রোমান আলঙ্কারিকেরা এ সত্য বিশদ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত করেন। প্রেরণার ওপরে সাহিত্যিকের হাত নেই, কিন্তু আত্মপ্রস্তুতির ওপরে অন্য মানুষদের মত তাঁরও পুরোপুরি হাত আছে। আত্মপ্রস্তুতি সচেতনপ্রয়াস-সাপেক্ষ। তার নানা দিক আছে—সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার দুটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব শিল্পই মাধ্যমনির্ভর, এবং মাধ্যমকে বশে না আনতে পারা পর্যন্ত সে মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব। বশে আনার অর্থ সে মাধ্যমের বিচিত্র সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং সে সব সম্ভাবনাকে প্রকাশের উপায়রূপে ব্যবহার করার সামর্থ্য অর্জন করা। সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। ভাষা তো সকলেই ব্যবহার করে, কিন্তু ভাষার মধ্যে কতখানি প্রকাশের শক্তি নিহিত আছে তার খোঁজ শুধু সাহিত্যশিল্পী রাখেন। সে খোঁজ পাবার জন্যে তাঁকে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। ধ্বনিতে ধ্বনিতে ছন্দোব্যঞ্জনার কত যে পার্থক্য, শব্দচয়ন এবং বাক্যগঠনের বিচিত্র কৌশলে অল্প কথার মধ্যে কত বেশী অর্থ যে ধরানো যায়, ঠিক কোন্ শব্দটি কি ভাবে প্রয়োগ করলে একটি উদ্দিষ্ট ভাব বা অভিজ্ঞতা তার যথার্থ প্রকাশ লাভ করে, এ সব বিষয়ে সূক্ষ্মজ্ঞান এবং সে জ্ঞান প্রয়োগে নিপুণতা বড় সহজে অর্জন করা যায় না। সাহিত্যিকের আত্মপ্রস্তুতির জন্যে তাই 'মাধ্যমচর্চা

একান্ত প্রয়োজন ; সুতরাং মননশীলতা সাহিত্যসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে লেখকের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধি থাকা দরকার। অভিজ্ঞতা ছাড়া কল্পনার বিস্তার এবং বৈচিত্র্য সম্ভবপর নয়। অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ উভয়সূত্রেই অর্জিত হতে পারে। কিন্তু যে সূত্রেই লব্ধ হোক, সে অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করতে হ'লে তাকে মননের দ্বারা জারিত ক'রে নিতে হয়। শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না ; সাহিত্যের উপাদান হ'ল তাৎপর্যের দ্বারা অন্বিত অভিজ্ঞতা। এ কাজও সাধনাসাপেক্ষ। এক ধারে মাধ্যমের সাধনা এবং অন্য ধারে অভিজ্ঞতার সাধনা, এ দুয়ের সমাবেশ ঘটলে তবে সাহিত্যপ্রেরণা সাহিত্যরূপে ফলপ্রসূ হতে পারে। এতখানি মননশীলতার সংযম যাঁরা স্বেচ্ছায় স্বীকার ক'রে থাকেন, তাঁদের অসংযমী কি অস্থিরবুদ্ধি ব'লে অভিযুক্ত করা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্লেটোর যুক্তিতে এ ছাড়া আরও একটি মারাত্মক ভুল বর্তমান। যৌক্তিকতা এবং মুক্তিস্পৃহার মধ্যে প্রবণতার দিক হতে বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে অনতিক্রমণীয় মনে হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মধ্যে গূঢ় সহযোগিতার ফলেই মানুষের বিকাশ সম্ভবপর হয়। এ কথা ঠিক যে, মুক্তিস্পৃহার প্রবণতা সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে ফেলার দিকে ; অন্য ধারে যুক্তি শুধু যে নিয়মানুগ তাই নয়, যা আপাতদৃষ্টিতে শৃঙ্খলাহীন তার মধ্যে নিয়মের সন্ধান করাই তার কাজ। তবু মুক্তি যদি শুধু নঙর্থক না হয়, তবে জ্ঞানের সহযোগ ছাড়া তার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। এবং সংসারে নিয়মের রাজত্ব আবিষ্কার করা নিরর্থক, যদি না সে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে পারে। বিকাশের এ ডায়ালেকটিক যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না তাঁদের দর্শনে হয় যুক্তিবুদ্ধি নয় মুক্তিস্পৃহা অবহেলিত হয়। প্রথমটির উদাহরণ রুশো, দ্বিতীয়টির উদাহরণ

প্লেটো। এবং এদের মধ্যে একটিকে অবহেলা করলে অন্যটির রূপও যে বিকৃত হয়, এই দুই অসামান্য প্রভাবশালী দার্শনিকের রচনা তারই প্রমাণ। মুক্তিস্পৃহাকে অবহেলা করার ফলে প্লেটোর চিন্তায় যুক্তিবুদ্ধি স্বমার্গ ত্যাগ ক'রে অতিপ্রাকৃত সাধনায় নিয়োজিত হয়েছে। অন্য ধারে যুক্তিকে পরিহার করার ফলে রুশোর দর্শনে মুক্তিস্পৃহা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে যূথবদ্ধ গড্ডলবৃত্তিতে।

এখন প্রেরণা এই মুক্তিস্পৃহারই একটি বিশেষ প্রকাশ। সাহিত্য প্রেরণাসঞ্জাত ব'লে সাহিত্যের মধ্যে মুক্তির এক অতি গূঢ় দুর্লভ স্বাদ পাওয়া যায়। প্লেটো সম্ভবত তা জানতেন এবং হয়তো সে কারণেই তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে প্রেরণার জন্যে কোন স্থান রাখেন নি। তাঁর আশঙ্কা ছিল সাহিত্যের মারফৎ মানুষ যদি মুক্তির স্বাদ পায়, তবে তারা আর তাঁর নিয়মনিয়ন্ত্রিত দার্শনিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা মানতে চাইবে না। তাঁর আশঙ্কা যে ভিত্তিহীন এ কথা বলতে পারি না ; কিন্তু সে আশঙ্কাই কি প্রমাণ করে না যে, তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের বনিয়াদ অত্যন্ত দুর্বল, যে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শটাই অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ভ্রান্ত? ব্যক্তির মুক্তিস্পৃহাকে অবদমিত করতে চায় যে রাষ্ট্র, তাকে কোন্ অর্থে আদর্শ বলতে পারি? সাধারণভাবে মুক্তিস্পৃহাকে, বিশেষভাবে প্রেরণাকে আত্মপ্রস্তুতির দ্বারা মার্জিত, শীলিত করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে স্পৃহা ও প্রেরণাকে সমূলে উৎপাটিত করা যে প্রস্তুতির উদ্দেশ্য, তাকে আত্মঘাতী ছাড়া আর কি বলা যায়? বাস্তবিক পক্ষে মানুষের জীবনে সাহিত্য যে এত মূল্যবান, এই প্রেরণাগুণ কি তার অন্যতম প্রধান হেতু নয়? কেননা, প্রেরণা শুধু সাহিত্যস্রষ্টাকেই মুক্তির স্বাদ দেয় না, সাহিত্যভোক্তাকেও সে স্বাদে সমৃদ্ধ ক'রে থাকে। মানুষের জীবনে এ স্বাদের কোন তুলনা নেই। প্লেটো নিজে এ স্বাদে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ স্বাদে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

সৌভাগ্যবশত প্লেটোর সে চাওয়া বাস্তবজীবনে কার্যকরী হয় নি। কাহিনী আছে যে, তাঁর শিষ্য ডিওনিসিয়স যখন সিরাকুসের শাসনকর্তা, তখন তিনি শিষ্যের মারফৎ সে দেশকে নিজের আদর্শ অনুযায়ী গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে সে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দেয় এবং প্লেটোকে আত্মরক্ষার জন্যে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনা 'Laws' গ্রন্থে তিনি যে দর্শনের চাইতে ধর্মের ওপরে বেশী জোর দিয়েছিলেন, অনেক পণ্ডিতের মতে এটা আসলে ঐ রূঢ় অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া। সে যাই হোক, প্রত্যক্ষভাবে তাঁর জীবন-দর্শনকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রূপ দিতে না পারলেও, পরোক্ষভাবে সে দর্শন যে পরবর্তী প্রায় আড়াই হাজার বছরের পশ্চিমী চিন্তা এবং জীবনযাত্রার ওপরে প্রবল প্রভাব ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। হোয়াইটহেড তো বলেছেন যে, পশ্চিমী চিন্তার ইতিহাস প্লেটোর পাদটীকা মাত্র। এটা হয়তো অতিশয়োক্তি; কিন্তু আজও যে ইয়োরোপীয় মানস প্লেটোনিক জীবনদর্শনের মারাত্মক প্রভাব অতিক্রম করতে পারে নি, তার হাজারো প্রমাণ চোখে পড়ে। অধুনা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব সার্বিক জীবনদর্শন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তাদের সঙ্গে প্লেটোনিক চিন্তার আত্মীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং অন্য কোন যুক্তি-প্রমাণ যদি নাও দেখানো হয়, শুধু এই সব রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা হতেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, প্লেটোনিক জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কি শিল্পসাহিত্য, কি মানুষের মুক্তিসাধনা উভয়ের ভবিষ্যৎই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন।

রেনেসাঁসের সাধনা

চোদ্দ শতকের আরম্ভ হতে সতের শতকের সূচনা—কমবেশী এই তিনশ' বছরের মধ্যে পশ্চিম ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক জীবনে যে প্রবল, গভীর এবং ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল, পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা তার নাম দিয়েছেন রেনেসাঁস।[১] শব্দটির স্রষ্টা কে ঠিক জানি না, তবে আমার নিজের পড়ার মধ্যে কথাটির প্রথম উল্লেখ ভাসারীর ইতিহাসে লক্ষ্য করেছি। ভাসারী নিজে রেনেসাঁসের শেষ যুগের একজন চিত্রশিল্পী। তিনি তাঁর পূর্বসূরী শিল্পীদের কাহিনী লিখতে গিয়ে তৎকালীন চারুকলার আশ্চর্য পুনরুন্মেষ অর্থে কথাটি প্রয়োগ করেছেন। এটি কিন্তু রেনেসাঁসের সঙ্কীর্ণ অর্থ। ব্যাপক অর্থে রেনেসাঁস বলতে পশ্চিম ইয়োরোপে ঐ তিনশ' বছরের মধ্যে যে বহুমুখী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার সবটাই বোঝায়। আঠার শতকের শেষাশেষি এবং উনিশ শতকের গোড়া হতে ঐতিহাসিকেরা

॥১॥ রেনেসাঁসের সনতারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। গেবার, কুরাজ প্রমুখ কোনো কোনো ঐতিহাসিক ত' রেনেসাঁসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্রেফ অস্বীকার করেছেন। এঁদের মতে রেনেসাঁসের যা বৈশিষ্ট্য মধ্য যুগেও তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ মতের মধ্যে যেটুকু সত্য তা' নিতান্ত আংশিক। ইতিহাসে কোনো ঘটনাই আগের এবং পরের ঘটনাস্রোত হতে বিচ্ছিন্ন নয়। রেনেসাঁসের যুগে যে মেজাজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল মধ্য যুগে কালেভদ্রে তার কিছুকিছু আভাস মেলে বটে, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। এঁদের মত ছেড়ে দিলেও, অনেক ঐতিহাসিক আছেন যাঁরা বারো এবং তেরো শতককেও রেনেসাঁসের যুগ মনে করেন ; এমনকি কেউ কেউ এগার শতককেও রেনেসাঁসের অন্তর্গত করতে চেয়েছেন। এঁদের মতও যুক্তিসহ মনে হয় না। কেননা ঐ তিনশতকে দু'চার ক্ষেত্রে রেনেসাঁসী দৃষ্টিভঙ্গীর যদিবা পূর্বাভাষ চোখে পড়ে, সে দৃষ্টিভঙ্গী না কোথাও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে, না এমন কোনো ব্যক্তি দেখা দিয়েছেন যাঁর মনোভাব মুখ্যত মধ্যযুগীয় নয়। উদাহরণ হিসেবে রজার

ক্রমে রেনেসাঁসের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বিষয়ে অবহিত হতে শুরু করেন: এঁদের মধ্যে বিশেষ করে ইংরেজ ঐতিহাসিক হালাম এবং তাঁর চাইতেও বিশেষ করে ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলে-র নাম উল্লেখযোগ্য। বিদগ্ধজনদের মধ্যে রেনেসাঁস বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি এবং চেতনাসঞ্চারের প্রধান কৃতিত্ব কিন্তু ফরাসী প্রাবন্ধিক এবং ঔপন্যাসিক স্তাঁদালের প্রাপ্য। তাঁর লেখার মধ্যেই প্রথম রেনেসাঁসী যুগপরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক মনের অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিক সংযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বুর্কহার্ট প্রভৃতির ঐতিহাসিক গবেষণা এবং আরো সম্প্রতি কাসিরের, মার্টিন, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের ফলে রেনেসাঁস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরো স্পষ্টতা এবং ব্যাপকতা অর্জন করেছে।

বেকন কি দান্তের উল্লেখ করা চলে। এঁরা রেনেসাঁস এবং মধ্যযুগের মধ্যে সেতুবন্ধ। রেনেসাঁসী মানবতন্ত্রের কোনো কোনো দিক এঁদের মধ্যে সক্রিয়, কিন্তু সমগ্রভাবে ধরলে এঁদের জীবনবোধ মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের অনুগামী। অপরপক্ষে কিছু ঐতিহাসিক শুধুমাত্র পনের শতককে রেনেসাঁসের যুগ আখ্যা দিয়েছেন। এ মতও আমার সমীচীন মনে হয় না। একথা ঠিক যে পনের শতকে বিশেষ করে ইতালীতে রেনেসাঁসী মন সবচাইতে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্যণীয় যে তার প্রায় একশ, বছর আগে ইতালিতে রেনেসাঁসী দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট প্রকাশ এবং ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাছাড়া রেনেসাঁস ইউরোপের সব দেশে একসঙ্গে সমানভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেনি। প্রথমে ইতালি, পরে জর্মানী ও উত্তর ইউরোপ, ফ্রান্স ও স্পেন এবং সবশেষে ইংলণ্ডে রেনেসাঁস বিকাশ লাভ করে। এই হিসেবে পেত্রার্ক-বোকাচ্চিও হতে শেক্সপীয়র-সর্ভান্তেসের কালকে রেনেসাঁসের যুগ বলা সমীচীন মনে করি। পেত্রার্কের জন্ম ১৩০৪ সালে; দেকামেরণ ১৩৪৮-৫৩ সালের মধ্যে লেখা; ডন কীক্সোট প্রথম খণ্ডের প্রকাশের তারিখ ১৬০৫; এবং সর্ভান্তেস এবং শেক্সপীয়র উভয়েই মারা গেছেন ১৬১৬ সালে। এই তিনশ বছর আমি রেনেসাঁসের যুগ বলে গণ্য করেছি।

রেনেসাঁস সম্বন্ধে এসব আলোচনা হতে জানা যায় যে রেনেসাঁসের মধ্য দিয়েই প্রথম আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটেছিল। সে সভ্যতা শুধু পশ্চিম ইয়োরোপে আবদ্ধ থাকে নি, তার প্রভাব ক্রমে কমবেশী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। রেনেসাঁস-উত্তর ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে উনিশ শতকে। সে পরিচয়ের সূত্র না ছিল সুখের, না সম্মানের। তবু তারি ফলে যে এদেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ পরিবর্তনের সূচনা ঘটে, একমাত্র অন্ধ জাতীয়তাবাদী ছাড়া কেউই সেকথা অস্বীকার করতে পারবেন না। সে পরিবর্তনের চেহারাটা সম্ভবত সবচাইতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বাংলা দেশে—বিশেষ করে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা, মাইকেলের কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও উপন্যাস এবং দীনবন্ধু মিত্রের নাটক—এসবই মুখ্যত পশ্চিমী রেনেসাঁসের ঐতিহ্যের সঙ্গে এদেশী মনের পরিচয়ের ফসল। নানা কারণে এ পরিবর্তন আজ পর্যন্ত এদেশে কোনো জীবন্ত এবং সুদূরপ্রসারী ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারে নি। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এবং যুক্তিবিমুখ ধর্মান্ধতা পশ্চিমের সান্নিধ্যজাত ভারতীয় রেনেসাঁস আন্দোলনকে ব্যাহত এবং ক্রমে বিকৃত করেছে। রামমোহন যার সূচনা ঘটিয়েছিলেন তার অকালমৃত্যু ঘটেছে দক্ষিণেশ্বরে, পণ্ডিচেরীতে, সেবাগ্রামে।

ফলে আধুনিক কালে ভারতীয় মনের উন্মেষের ইতিহাস ভূমিকার পাতাতেই নিঃশেষিত। দেশ যতদিন বিদেশীর অধিকারে ছিল, ততদিন এদশার কারণ হিসেবে পরাধীনতার সাফাই দেওয়া চলত। অবশ্য সে সাফাই কতখানি যুক্তিসহ তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। ইংরেজ দেশ দখল করার আগে বেশ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এদেশে কি রেনেসাঁসের অনুরূপ কোনো ব্যাপক সৃষ্টিশীল আন্দোলনের আভাস চোখে পড়ে? মোগল-পাঠান রাজপুত-মারাঠার আমলেও

কি আমরা মধ্যযুগের পশ্চিমীদের মত দিব্যি কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে আর অতীতের জাবর কেটে দিনগুজরান করছিলাম না? বেঁচে থাকা মানে যে শুধু টিঁকে থাকা নয়, জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য যে সম্ভোগ এবং বিকাশের মধ্যে নিহিত, আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিত অথবা মোল্লা-মৌলভীরা কি সাধারণ মানুষকে কোনোদিন একথা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন? যুক্তির চাইতে অন্ধবিশ্বাস শ্রেয়, আত্মপ্রকাশের চাইতে আত্মবিলোপ কাম্য, ব্যক্তির স্বাধীন প্রচেষ্টার চাইতে প্রাক্তনের কর্মফল বেশী প্রবল—ইংরেজ এদেশ জয় করবার বহু আগে হতেই কি এসব তত্ত্বকথা আমাদের মন, ব্যবহার, সমাজ এবং ব্যক্তিজীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে নি? অতএব কারো মনে যদি এ প্রশ্ন জাগে—পরাধীনতার জন্যে আমাদের এ দশা, না এ দশা হয়েছিল বলেই আমরা পরাধীন হয়েছিলাম—তবে তাকে একেবারে বাজে প্রশ্ন বলে খারিজ করা শক্ত হবে।

সে যা হোক এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের মধ্যে যাঁরা গুণী শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁদের অন্তত অবহিত হওয়া দরকার যে রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মন এবং সমাজ আজো ভূতে-পাওয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ দশা না ঘুচলে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিশেষ কোনো মূল্য থাকবে না—এমনকি সে স্বাধীনতা আদপে টিঁকবে কিনা তাতেই খুব সন্দেহ আছে। আমাদের দেশে আজ এক ব্যাপক এবং বহুমুখী রেনেসাঁস ঘটাবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার জন্যে জমি তৈরী করা দরকার, দরকার রেনেসাঁস সম্বন্ধে দেশের নানা স্থানে নানা ভাষায় বিস্তৃত আলোচনার। বিশ শতকের রেনেসাঁস স্বভাবতই পাঁচ-ছ' শ'বছর আগেকার আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি হবে না। কিন্তু সে আন্দোলন যেমন একদা গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিল, এযুগের রেনেসাঁসও তেমনি পূর্বেকার আন্দোলন হতে শিক্ষা এবং প্রেরণা লাভ করবে। সুতরাং আজ যাঁরা

এদেশে মানবপ্রতিভার সৃষ্টিশীল ব্যাপক স্ফুরণে ব্রতী হবেন, আধুনিক যুগের সূচনায় পশ্চিম ইয়োরোপে যে মহৎ ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটেছিল তার স্বরূপ বিষয়ে তাঁদের অবশ্যই অম্বিষ্ট হতে হবে।

তাছাড়া এর চাইতেও একটি বড় কারণে রেনেসাঁসের ঐতিহ্যবিষয়ে আমাদের অবিলম্বে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে। রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে যে জীবনদর্শন একদিন ব্যক্তি এবং সমাজকে বিকাশের সাধনায় অনুপ্রেরিত করেছিল, সম্প্রতিকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তার প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক ভাবে অবসন্ন হয়ে আসছে। পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে রেনেসাঁসী আদর্শ প্রথম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, এ অবসাদের লক্ষণ সেখানেই আজ সব চাইতে বেশী প্রকট। এ অবসাদের নানা কারণ আছে, কিন্তু একটা কথা খুবই স্পষ্ট যে এ অবসাদের কাছে আজ যদি আমরা হার মানি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ নিতান্তই অন্ধকার। আমরা আজ কালান্তরের যুগে বাস করছি; এ কালান্তরের মধ্য দিয়ে যদি আমরা সমৃদ্ধতর সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে চাই তবে রেনেসাঁসের জীবনদর্শন হতে আমাদের পথনির্দেশ গ্রহণ করতে হবে, পুষ্টি সংগ্রহ করতে হবে। তা যদি আমরা না করতে পারি, তবে এ কালান্তর যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে তাতে মানুষ হবে একান্ত ভাবে যন্ত্রের দাস, ব্যক্তি পর্যবসিত হবে যূথবদ্ধ জীবে, অনুসন্ধানের আর কোন অবকাশ থাকবে না, মানুষের দীর্ঘযুগব্যাপী বিকাশ-সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটবে স্বেচ্ছাবৃত আত্মবিলোপে। সে ব্যবস্থার কিছুটা পূর্বাভাস আমরা ইতিমধ্যেই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিভিন্ন সর্বগ্রাসী সমাজদর্শন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে দেখতে পেয়েছি। মানবজাতির বৈশ্বিক আত্মহত্যাকে যদি আমরা নিয়তি বলে স্বীকার না করি, তবে এই কালান্তরের যুগে রেনেসাঁসের অবসন্ন ঐতিহ্যে আবার আমাদের নতুন করে প্রাণসঞ্চার করতে হবে।

অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে বিশশতকী উজ্জীবনের জীবনদর্শন কখনোই পাঁচশো বছর আগেকার জীবনদর্শনের পুনরুক্তিমাত্র হতে

পারে না। পরিবেশ বদলে গেছে, নতুন নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান এবং কার্যকরী শক্তিরও প্রভূত বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে আধুনিক জীবনদর্শনকে পূর্বের তুলনায় অবশ্যই সমৃদ্ধতর হতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম করার দরকার আছে যে, রেনেসাঁসী ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করতে না পারা পর্যন্ত সে সমৃদ্ধতর জীবনদর্শনের উদ্ভব অকল্পনীয়। রেনেসাঁসের সাধনা বিষয়ে সচেতন হওয়া তাই শুধু ভারতবাসীর পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন নয়, এ প্রয়োজন বিশ্ববাসীর। এবং এ চেতনার ফলে যে আন্দোলন রূপপরিগ্রহ করবে, তা কোনো দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না, তা হবে ইতিহাসের প্রথম প্রকৃত সর্বমানবীয় আন্দোলন।

দুই

চোদ্দ শতক হতে সতের শতকের মধ্যে ইয়োরোপের জীবনে যে ঐতিহাসিক পবিবর্তন ঘটেছিল তাব মূল কথাটি কি? পরিবর্তন ত শুধু একদিকে ঘটে নি। সাহিত্যে বলুন, চিত্রে বলুন, নীতি-ন্যায়, আইনকানুন, সমাজসংগঠনে বলুন, মানুষের সঙ্গে মানুষ এবং মানুষের সঙ্গে জগতের যে বিচিত্র সম্পর্ক তার যে-কোনো দিকেই বলুন, সব ক্ষেত্রেই এই তিনশ' বছরের মধ্যে আশ্চর্য রকমের রূপান্তর চোখে পড়ে। এই বহুমুখী রদবদলের মধ্যে এমনকি কোন ঐক্য আছে যা অসংখ্য ঘটনাকে একটি সমগ্র ধারার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছে? আমার ধারণা, ইয়োরোপের এই তিনশ' বছরের ইতিহাসের কেন্দ্রে এমনি একটি সূত্র অতি সুস্পষ্টভাবে বর্তমান এবং আমরা যাকে আধুনিক সভ্যতা বলি এই সূত্র তারি মুখ্য ধারক। সেই সূত্রের ইংরেজী নাম হিউম্যানিজ্‌ম্, বাংলায় একে মানবতন্ত্র বলা যেতে পারে।

নামেই প্রকাশ মানবতন্ত্রের মুখ্য উপজীব্য স্বয়ং মানুষ। ব্রহ্ম,

ঈশ্বর, দেবদেবী, ভূতপ্রেত কি ঐ-জাতীয় অতিমানবিক কল্পনা নয়; আপনি, আমি এবং আরো কোটি কোটি প্রত্যক্ষ, প্রাতিস্বিক, বাস্তব নরনারীকে নিয়েই মানবতন্ত্রের যা কিছু ভাবনাচিন্তা। মানবতন্ত্রী দৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে তাহ'ল যে, এ দৃষ্টি স্পষ্ট করেই আধ্যাত্মিকতামুক্ত। এ সংসারে সত্য মিথ্যা, ভালোমন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, সব কিছুরই বিচারক এবং মানদণ্ড মানুষ নিজে। তার জন্যে কোনো ঈশ্বর-জাতীয় কল্পনার একেবারেই প্রয়োজন নেই।[২] আসলে ঈশ্বর, দেবদেবী বা ঐ-জাতীয় বিচিত্র কল্পনা মানুষেরই মস্তিষ্কজাত। গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের সেই যে বিখ্যাত উক্তি —মানুষ সবকিছুর মাপকাঠি—মানবতন্ত্রের এটি হল অন্যতম মূল প্রত্যয়।

মানুষ শুধু সবকিছুর মাপকাঠি নয়, মানুষই মনুষ্যত্বের একমাত্র উৎস। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে পুনরুক্তি মনে হতে পারে, কিন্তু আজো পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী যে সব মূঢ় বিশ্বাসের দ্বারা আচ্ছন্ন সেগুলিকে স্মরণ করলে এ প্রস্তাবের অভিনবত্ব এবং যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে না। এদেশে আমাদের পিতামহ, প্রপিতামহেরা

॥ ২ ॥ তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রীরা সকলেই নাস্তিক ছিলেন। বরং উল্টোটাই সত্যি যে তাঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর এবং ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করেন নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্যি যে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা মুখ্যত ঐহিক বিষয় নিয়েই ব্যাপৃত ছিল, এবং যতই তাঁদের আন্দোলন স্পষ্টতা অর্জন করতে থাকে ততই তাতে ধর্ম এবং চার্চের প্রভাব কমে আসে। মেকিয়াভেল্লীর "vertu" সম্পূর্ণ মানবিক গুণ, তাতে আধ্যাত্মিকতার আভাস মাত্র নেই। বুর্কহার্ট নিজে ধার্মিক ব্যক্তি হয়েও তাই স্বীকার করেছেন যে রেনেসাঁসের চিন্তানায়কেরা ধর্ম, পাপ, পরিত্রাণ, স্বর্গ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। মর্ত্যলোকে মানুষের জীবন নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন।

নিজেরা শিখে এসেছিলেন এবং তাঁদের পুত্র-প্রপৌত্রগণ আমাদের এতাবৎ শিখিয়ে এসেছেন যে মনুষ্যত্বের উৎস আসলে মানুষ নয়, তার মধ্যে পরমাত্মার যে খণ্ডিত রূপ জীবাত্মারূপে বর্তমান তিনিই নাকি মনুষ্যত্বের মূলাধার। গোঁড়া ক্রিশ্চানেরা এটুকু পর্যন্ত স্বীকার করেন না, কেননা তাঁদের মতে মনুষ্যত্বের মধ্যে ভাল বলে কিছুই নেই, মানুষের অস্তিত্ব আদিম পাপের দ্বারা চিহ্নিত, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া সে পাপ হতে আমাদের পরিত্রাণ অসম্ভব। মানুষের যা কিছু গুণ তা যে মানুষের নিজের অস্তিত্ব হতেই পাওয়া, এবং সে অস্তিত্ব যে একান্তভাবে জৈব, প্রাক্‌মানবতন্ত্রী মন মনুষ্যত্বের এই স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে একেবারেই অসমর্থ। রেনেসাঁসের নায়কেরা প্রথম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলে যে মানুষের বিচিত্র সম্ভাবনাসমষ্টির নাম মনুষ্যত্ব, আর সে সম্ভাবনার হেতুনির্ণয়ের জন্য মানব-অতিরিক্ত কোনো কল্পনার প্রয়োজন নেই।

মনুষ্যত্ব যদি মানুষেরই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমষ্টির অপর নাম, তবে মানুষের বিকাশের জন্য কোনো অতিমানবিক শক্তির কল্পনা স্পষ্টতই অবান্তর। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা; তার ভাগ্য রচনা করার ক্ষমতা তার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে। রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা পুরোপুরি, অধ্যাত্মপ্রত্যয়ের প্রভাব এড়াতে পারেননি এমনকি তাঁরাও মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের ওপরে জোর দিয়েছেন। পিকো দেলা মিরান্দোলা তাই তাঁর "মানুষের মহত্ব বিষয়ক নিবন্ধে" লিখেছেন — "ঈশ্বর আদমকে বললেন, দেখ তোমাকে আমি মুক্ত জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছি। আমার অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে বিকাশ নেই। কিন্তু তুমি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে নিজেকে যেভাবে খুশি বিকশিত করতে পার। শুধু তোমার মধ্যেই বৈশ্বিক জীবনের বীজ উপ্ত আছে।" রেনেসাঁসের আরেকজন মহৎ মানবতন্ত্রী আলবর্তি লিখেছেন: "মানুষ যদি ইচ্ছে করে তবে সবকিছুই সে করতে পারে।" জ্যোভানি

ভিলানির মতে "কোনো গ্রহনক্ষত্র বা দৈবশক্তি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে দমিত করতে পারে না।"

অর্থাৎ মানুষ কারো হাতের যন্ত্র নয়, সে নিজেই যন্ত্রী ; সে কোনো অতিমানবিক উদ্দেশ্যসাধনের উপাদান নয়, তার নিজের অস্তিত্ব এবং বিকাশের প্রয়োজনেই সে নানা উদ্দেশ্য কল্পনা করে এবং সেই দিকে আপনাকে চালিত করে। প্রতি মানুষের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনা বর্তমান ; মানুষ নিজের চেষ্টায় সেই সম্ভাবনাকে সার্থকায়িত করে তোলে। এইভাবে মানুষ নিজেকে নিজে বারবার সৃষ্টি করে, তার অপর কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই। মানুষের ইতিহাস আসলে তার এই নিরন্তর সৃষ্টি-প্রচেষ্টার ইতিহাস। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি এই প্রচেষ্টারই প্রকাশ মাত্র।

মানুষ যে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ণয় করতে পারে তার প্রধান কারণ দুটি—একটি হোল তার বুদ্ধি আর অন্যটি হোল তার মুক্তিস্পৃহা। এ দুটিই তার অস্তিত্বগত গুণ। অন্য জীবজন্তুরও এ দুটি গুণ আছে, কিন্তু মানুষেব ক্ষেত্রে দেহ এবং বিশেষ করে মস্তিষ্কের আশ্চর্য বিবর্তনের ফলে এ গুণ দুটি অসামান্য সম্ভাবনার আকর রূপে দেখা দিয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রকাশ বহুমুখী। বুদ্ধির দ্বারা মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সূত্রের অনুধাবন করতে পারে, এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজের নানা উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগায়। বুদ্ধি মানুষকে সত্যান্বেষী করে, তার বিক্ষিপ্ত, খণ্ড খণ্ড, জঙ্গম অভিজ্ঞতাকে চিন্তা বা ভাবের মধ্যে স্থায়ী রূপ দেয়, তার ধারণায় ব্যাপকতা, স্পষ্টতা এবং যাথার্থ্য আনে। মানুষ অত্যন্ত অনুভূতিশীল বলে তার জীবনে বহুমুখীনতা, জটিলতা, পরিবর্তনশীলতা এবং দ্বন্দ্ব অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশী প্রবল। বুদ্ধি বহুত্বের মধ্যে ঐক্য আনে, দ্বন্দ্বের মধ্যে সৌষম্য ঘটায়, পরিবর্তনকে স্থিতিস্থাপক করে তোলে—এককথায়, ব্যক্তি-অস্তিত্বে সমগ্রতা সম্পাদন করে। শুধু তাই নয়, বুদ্ধির

ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভাবনার লেনদেন সম্ভব হয়, বিচিত্ররূপে সামাজিক সহযোগিতা গড়ে ওঠে। এবং বুদ্ধির বিকাশের ফলেই মানুষ ভাষা, যন্ত্র, রীতিনীতি, প্রয়োগপদ্ধতি ইত্যাদির উদ্ভাবন করে নিজের অন্তর্নিহিত অফুরন্ত সম্ভাবনাকে নানাভাবে সার্থকায়িত করতে পারে।

আর এই বিচিত্র সম্ভাবনাকে সার্থকায়িত করারই অপর নাম মুক্তি। এদেশের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় মুক্তি কথাটা এমন এক অদ্ভুত অর্থ নিয়েছে যে, মানবতন্ত্রী চিন্তার ব্যাখ্যায় শব্দটি প্রয়োগ করতে সঙ্কোচ বোধ হয়। আমরা এদেশের মুক্তি বলতে বুঝি জীবন্মুক্তি। অর্থাৎ জীবদেহ আমাদের কাম্য নয়, কোনো রকমে এ দেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মে বিলীন হতে পারলেই আমাদের মোক্ষ। যে দেশে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো সুখ নেই, সম্ভোগ নেই, বিকাশ নেই, যে দেশে বাঁচাটা প্রায় কোনোক্রমে টিঁকে থাকার সামিল, সেখানে এধরণের বিকৃতবুদ্ধি তত্ত্বকথায় কারো তেমন অবাক ঠেকে না। কিন্তু মানবতন্ত্রের সাধনা মরে বাঁচার সাধনা নয়। মানবতন্ত্রী মুক্তি বলতে বোঝেন ব্যক্তির স্বচেষ্টাপ্রসূত বিচিত্র বিকাশ। প্রতি মানুষের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে রূপায়িত করতে হলে একধারে ব্যক্তির দেহমনের ক্ষমতা বাড়াতে হবে, অন্যধারে পরিবেশের বাধাগুলিকে অপসারিত করতে হবে। এই ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বুদ্ধিকে মার্জিত করা দরকার, অনুভূতিকে সূক্ষ্মতর করা দরকার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সক্রিয় করা দরকার, সম্ভোগের দ্বারা দেহ এবং মনকে সরস এবং সতেজ রাখা দরকার, আর সবচাইতে দরকার ব্যক্তি-অস্তিত্বে সুষম সমগ্রতা অর্জন করা। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহমনের এই বিকাশ ঘটে মানবতন্ত্রী তাকেই যথার্থ শিক্ষা বলে মনে করেন। অপরপক্ষে পরিবেশের বাধা অপসারিত করার জন্য চাই বিজ্ঞান—পদার্থবিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—এবং ক্রমোন্নতিশীল যন্ত্র, রীতিনীতি ইত্যাদির

সাহায্যে জ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ। নিজেকে অনুশীলিত করে এবং পরিবেশকে বশে এনে মানুষ আপনার বিকাশের দিগন্তকে প্রসারিত করে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হতে পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করে থাকবেন যে, মানবতন্ত্রী দৃষ্টিতে বুদ্ধি এবং মুক্তির সাধনা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বুদ্ধি ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ অসম্ভব এবং ব্যক্তির বিকাশ না ঘটলে বুদ্ধি ক্রমেই জড়ত্ব লাভ করে। সত্যসন্ধিৎসা মুক্তিপ্রয়াসকে সার্থক হতে সাহায্য করে, আবার মুক্তিপ্রয়াস সত্যসন্ধিৎসাকে অবসন্ন হতে দেয় না। অপরপক্ষে বুদ্ধিবিমুখ মন স্বতই আত্মবিলোপে সার্থকতা খোঁজে, আর দাস্যভাবের সাধকেরা যে অতিসযত্নে সব রকম প্রশ্নশীলতাকে এড়িয়ে চলেন ধর্মচর্চার ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলবে। মানবতন্ত্রের নায়ক দাস নয়, সে কর্তা। অনুশীলিত বুদ্ধির দ্বারা সে এই নিয়মনিয়ন্ত্রিত জগৎকে তার স্বীয় বিকাশের উপাদানে পরিণত করেছে। মানবতন্ত্রী দর্শনে জ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তি, ক্লাসিক কার্যকারণ বোধ এবং রোমান্টিক সৃষ্টিপ্রেরণা পরস্পরের বিরোধী নয়, তারা পরস্পরের সম্পূরক। মানুষ একাধারে ধীমান এবং মুক্তিকামী বলেই সে ইতিহাসের নায়ক।

তবে ইতিহাসের নায়ক বলে মানুষ ব্রহ্ম নয়। মানুষের অস্তিত্ব দেহের দ্বারা সীমায়িত; সুতরাং যে সর্বগ্রাসী ব্যাপকতা ব্রহ্ম নামক কল্পনায় আরোপ করা হয় তা কখনো ব্যক্তি-অস্তিত্বের গুণ হতে পারে না। ফলে মানুষের বিকাশসাধনায় এমন কোন স্তর নেই যাকে চরম বলে মানা যেতে পারে। মানুষ নানারূপে নানাভাবে নিজেকে বিকশিত করছে, কিন্তু তার কোনো রূপটিই এমন নয় যার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সব সম্ভাবনা একদেহে আকার লাভ করেছে। ব্রহ্ম এমনি কল্পনা যার কোনো দেহাশ্রিত বাস্তবীকরণ অসম্ভব। ব্রহ্মত্ব অর্জন তাই মানুষের সাধনা নয়। তার সাধনা নিজের অন্তর্নিহিত বহুমুখী সম্ভাবনাকে

নানারূপে বিকশিত করা। মানবতন্ত্রের আদর্শ ব্রহ্ম নয়, তার আদর্শ L'uomo Universale বা বৈশ্বিক মানব।[৩]

ব্রহ্মত্বে মানবতন্ত্রীর এই অনাস্থা বুদ্ধির পরিশীলনের ক্ষেত্রে আরো সুস্পষ্ট। মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর এবং যেহেতু কোনো অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতাসমষ্টি বিশ্বপ্রকৃতির স্থানকালবিস্তৃত সীমাহীন সমগ্রতাকে আত্মস্থ করতে পারে না, সে কারণে জগৎ সম্বন্ধে সব ধারণাই অসম্পূর্ণ। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান নিরর্থ কল্পনা মাত্র। কোনো জ্ঞান সম্বন্ধেই একথা বলা চলে না এটি সম্পূর্ণ সত্য, এর পরে আর কিছু বলবার নেই। ইন্দ্রিয়গ্রামের সূক্ষ্মতাসাধনের ফলে, বিচিত্র এবং বহুমুখী অভিজ্ঞতা-রাশির সন্নিবেশের ফলে, অভিজ্ঞতাসন্নিবেশের পদ্ধতিগুলি মার্জিত হওয়ার ফলে মানুষের জ্ঞান ক্রমেই অধিকতর যাথার্থ্য অর্জন করে। মানুষের প্রতিটি ধারণাই প্রশ্নসহ; এবং এই প্রশ্নশীলতাই অধিকতর যাথার্থ্য অর্জনের একমাত্র পন্থা। সুতরাং যাঁরা যোগাভ্যাস কি অবতারতত্ত্ব কি ঐশী প্রেরণার সাফাই গেয়ে নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞ বলে দাবী করেন, তাঁদের সঙ্গে মানবতন্ত্রী বুদ্ধির কোনো রফা সম্ভব নয়। এই অর্থে মানবতন্ত্রী নিয়ত সংশয়বাদী; কোনো বাণী, তা সে বেদ বাইবেল কোরান গীতাতেই থাক, কি পোপ পুরোহিতের মুখ হতেই উচ্চারিত হোক, কি স্বৈরাচারী শাসনকর্তার সিংহাসন হতেই নেমে আসুক, মানব-তন্ত্রী তাকে আপ্তবাক্য বলে মানতে নারাজ। মানবতন্ত্রীর সত্যান্বেষণ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে স্তব্ধ হতে পারে না; সিদ্ধান্তে পৌঁছেও যাথার্থ্যের প্রয়োজনে সে সিদ্ধান্ত বদলাবার জন্য তার মন সব সময়েই

॥ ৩ ॥ রেনেসাঁসী সাহিত্যে ব্যক্তির বিকাশ প্রসঙ্গে একক মানুষ (uomo singolare), অনন্য মানুষ (uomo unico) এবং বৈশ্বিক মানুষ (uomo universale) এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমে ব্যক্তি নিজেকে গোষ্ঠী হতে স্বতন্ত্র করে দেখতে শেখে; তারপর ক্রমে সে তার স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে; এবং পরিশেষে এই বিকাশের পথে সে বৈশ্বিকতা অর্জন করে।

প্রস্তুত। লেওনার্দোর নোট বইতে, এরাজ্‌মুসের বিভিন্ন নিবন্ধে এবং সবচাইতে সুস্পষ্টভাবে মনতেনের প্রবন্ধাবলীতে রেনেসাঁসী উন্মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই উন্মুক্ততার ফলে এঁদের মন সব রকম গোঁড়ামী, সঙ্কীর্ণতা এবং অসহনশীলতা হতে মুক্তিলাভ করেছিল। রেনেসাঁসের যুগে এবং তারপরে দর্শন ও বিজ্ঞানের যে দ্রুতবিকাশ ঘটে, এই উন্মুক্ত সত্যসন্ধিৎসাই তার মূল উৎস। এই উন্মুক্ত নিরাসক্ত সত্যসন্ধিৎসা না থাকলে মানুষ স্বাধীনতার সাধক হতে পারত না। সেক্ষেত্রে মানুষের ইতিহাস পর্যবসিত হত বুদ্ধির-চোখে-ঠুলি-আঁটা, অভ্যাসের-জোয়ালটানা, আপ্তবাণীর-জাবরকাটা, ফূর্তিহীন, আনন্দহীন, অর্থহীন দিনগুজরানিতে।

তিন

পূর্বোক্ত দার্শনিক প্রস্তাবগুলিকে অবলম্বন করে মানবতন্ত্রী নীতিচিন্তা গড়ে উঠেছে। নীতিচিন্তা বলতে আমাদের মনে যে সব আধ্যাত্মিক হেতো ওষুধের স্মৃতি ভেসে ওঠে, মানবতন্ত্রী নীতিচিন্তার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। মানুষকে ব্যাধিগ্রস্ত জীব কল্পনা করে নিয়ে তার জন্য মোহমুদ্গরের দাওয়াই বাতলানোকে যাঁরা নীতিচিন্তা মনে করেন, তাঁরা বৃথাই মানবতন্ত্রে নৈতিকতার হদিশ খুঁজবেন। মানবতন্ত্রের দৃষ্টিতে মানুষ মাত্রেই অসীম সম্ভাবনার আকর, আর সেই সম্ভাবনা-রাশিকে কি ভাবে সার্থকায়িত করা যায়, মানবতন্ত্রী নীতিচিন্তার এইটি একমাত্র আলোচ্য।

প্রতি মানুষই যখন অসীম সম্ভাবনার আকর, তখন মানুষমাত্রেই অমূল্য। হরিপদ কেরানী অবশ্যই আকবর বাদশা নয়, কিন্তু তার সঙ্গে এ কথাও সত্যি যে হরিপদ কেরানীর অভাব আকবর বাদশার দ্বারা পূরণ করা যায় না। হরিপদ হরিপদ বলেই সে অদ্বিতীয়; অপর কোনো

কিছুকেই—তা সে যত মহৎ, যত মূল্যবানই হোক না কেন—তার এই প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের তুল্যমূল্য ভাবলে ঘোরতর ভুল করা হবে। অতএব মানুষমাত্রেই মূল্যবিচারের দিক হতে স্বয়ংসিদ্ধ; তার অতিরিক্ত কোনো অস্তিত্বের বাহন বা উপাদান হিসেবে তার মূল্য নির্ণীত হতে পারে না। মানুষ ঈশ্বর কি দেবদেবীর মহিমা প্রচারের বাহন নয়; দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ, শ্রেণী, বর্ণ, দল ইত্যাদি গোষ্ঠীগত স্বার্থের উদ্দেশ্য সাধনের সে যন্ত্র নয়; রাজা, পুরোহিত, মহাত্মা কি মালিকের প্রয়োজন মেটানোর সে উপায়-নয়। মনুষ্যজাতির যদি কোনো সার্বজনীন এবং স্বতঃসিদ্ধ উদ্দেশ্য থাকে তবে তা হল প্রতিটি ব্যক্তিকে অমূল্য জেনে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে ব্রতী হওয়া।

সুতরাং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশই হোল মানবতন্ত্রী নীতির মূল আদর্শ। এই বিকাশে যা সাহায্য করে, তা ভালো; এ বিকাশকে যা ব্যাহত করে তা মন্দ। যে নিয়ম, যে ব্যবহার, যে ক্রিয়াকলাপ, যে ভাবনা, যে সম্বন্ধ ব্যক্তির অস্তিত্বকে সমৃদ্ধতর করে তোলে, তাই যথার্থ কল্যাণকর। অপর পক্ষে যার ফলে অস্তিত্ব সঙ্কীর্ণতর, রুক্ষতর, ক্ষীণতর হয়, তাই অশিব, তাই অন্যায়। মানবতন্ত্রীব অন্বেষণ সেই আদর্শ সমন্বয়ের জন্য যাতে কোনো মানুষের বিকাশকেই ব্যাহত না করে প্রতি মানুষের বিকাশকেই সুগম করে তোলা যায়। এই অন্বেষণেরই প্রকাশ মানবতন্ত্রীর বিবেক। সে বিবেক তাই কোতোয়াল নয়, বরং তাকে বলা যায় কবি। তার স্ফূর্তি নিপীড়নে নয়, তার স্ফূর্তি বিকাশের নবতর, প্রকৃষ্টতর পদ্ধতির উদ্ভাবনে।

ব্যক্তির এই বহুমুখী বিকাশের জন্য চাই বিচিত্র এবং অব্যাহত সম্ভোগ, চাই অনুভূতির পরিশীলন, চাই মনের সুষমিত সমগ্রতা, চাই বুদ্ধির সূক্ষ্মতা সাধন, চাই জ্ঞানের প্রসার, চাই প্রকাশরীতির চর্চা, চাই মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এবং বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের অসঙ্কোচ আত্মীয়তা। বাঁচার মানে যদি টেঁকা না হয়ে ফুটে

ওঠা হয়, তবে তার জন্যে এর প্রত্যেকটিই অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই পৃথিবীতে কত ঐশ্বর্য ছড়ানো রয়েছে—কত রং, কত গন্ধ, কত ধ্বনি, কত স্বাদ, কত বিচিত্র অনুভূতির সম্ভাবনা—আর মানুষের দীর্ঘদিনের চেষ্টায় তাতে আরো কত নতুন ঐশ্বর্য না যুক্ত হয়েছে—কত ছবি, কত গান, কত বই, কত কল্পনা—এসব সম্ভোগ না করলে মানুষের দেহই-বা কি করে সরস হবে, মনই-বা কি করে সমৃদ্ধ হবে। মানবতন্ত্রীর নীতি চিন্তায় ভোগের স্থান তাই এত সম্মানের—কেননা ভোগ ছাড়া বিকাশই যে অসম্ভব। শুধু ভোগ নয়, সম্ভোগ, সম্যকরূপে ভোগ, রসিয়ে রসিয়ে, ভোগ্যবস্তুর মধ্যে যতখানি সম্পদ আছে তাকে পরিপূর্ণভাবে নিজের অভিজ্ঞতায় আত্মসাৎ করে। সেই ত' বিদগ্ধ সম্যকভোগে যে পারদর্শী। কনস্টান্টাইনের ডোনেস্যানের খাপ্পা ধরিয়ে দিয়ে যিনি অমর কীর্তি অর্জন করেন সেই লোরেঞ্জো ভালা তাই সম্ভোগের ওপরে একটা রীতিমত ডিস্‌কোর্স্ লিখে ফেললেন। ভোগ্য-বস্তু দেখলে যাদের মন ছিছি করে ওঠে, তারা ত' বেঁচেও বেঁচে নেই, তারা আবার বিকাশের কথা ভাববে কি করে। বিকৃত মনই শুধু আত্মনিপীড়নে বাহবার কারণ খুঁজে পায়; সুস্থমনের পরিপুষ্টি সম্ভোগে।

আর সম্ভোগের জন্য অনুভূতিকে পরিশীলিত না করলে চলে না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে সম্ভোগের উপাদান সংগ্রহ করি। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ যদি স্থূল হয় তবে সম্ভোগের উপাদানসম্ভারও দরিদ্র হতে বাধ্য; শুধু তাই নয়, সে ক্ষেত্রে সম্ভোগের অভিজ্ঞতাও দুর্বল এবং স্বল্পস্থায়ী হয়ে পড়ে। আমাদের অনুভূতি যত সূক্ষ্মতর হবে, ততই অস্তিত্বে সম্ভোগের বিচিত্রতর সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে পারব আর ততই আমাদের ভোগের অভিজ্ঞতা আরো গাঢ়ত্ব এবং স্থায়িত্ব অর্জন করবে। সম্ভোগ যে পরিশীলনসাপেক্ষ এদেশের বিদগ্ধজনেরা এককালে সেকথা খুব ভাল

করেই জানতেন—কামসূত্রে উল্লিখিত চৌষট্টিকলায় তার প্রমাণ আছে। রূপের সঙ্গে রূপের, সুরের সঙ্গে সুরের, সুরার সঙ্গে সুরার, চুম্বনের সঙ্গে চুম্বনের, সুরতের সঙ্গে সুরতের যে বিচিত্র পার্থক্য সম্ভব অথবা বর্তমান, অনুভূতির পরিশীলন সে তত্ত্বে মনকে পারদর্শী করে তোলে। আর এই পারদর্শিতা শুধু সম্ভোগকেই সমৃদ্ধতর করে না, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করে দেয় এবং প্রকাশ প্রচেষ্টাকেও বলিষ্ঠতর করে তোলে।

অতঃপর মনের সুষমিত সমগ্রতা। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নানা রকমের বাসনা-প্রবৃত্তি ক্রিয়া করছে। এর একটির দাবী মেটাতে গেলে অনেক সময় অন্যগুলিকে অবহেলা করতে হয়; এমন কি অনেক সময় তাদের অবদমিত করারও প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কোনো মূলবৃত্তিকে স্থায়ীভাবে অবদমিত রাখা সম্ভব নয়। সে চেষ্টায় মনের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও বাসনার মধ্যে সৌষম্যসাধনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সম্ভোগের দ্বারা প্রতিটি মূল বৃত্তিকে তৃপ্ত করতে হবে অথচ সঙ্গে সঙ্গে এটিও দেখতে হবে যাতে একটির পুষ্টি অন্যগুলির শীর্ণতার কারণ না হয়। সেই সম্ভোগই শ্রেষ্ঠ সম্ভোগ যার ফলে বিভিন্ন বৃত্তির একই কালে পুষ্টি সাধন হয় এবং এমনিতর সম্ভোগের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির সত্তা সুমিত সমগ্রতা অর্জন করে। এই সমগ্রতা অবশ্য কোনো সময়েই সম্পূর্ণ নয়; নব নব সম্ভোগ এবং প্রকাশের মধ্য দিয়ে তা পরিণতি হতে সার্থকতর পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। পরিণতির সবচাইতে প্রধান লক্ষণ এই সুমিত সমগ্রতা: সুমিত, কারণ কোনো বৃত্তিই অতি-প্রবল হয়ে অন্যদের আচ্ছন্ন করেনি; সমগ্র, কারণ এখানে বহুত্ব বিরোধকে অতিক্রম করে প্রাণময় ঐক্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বুদ্ধি এবং জ্ঞানের কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। প্রকাশ বিকাশেরই বহিরঙ্গ। বিকাশের পথে বিচিত্ররূপে ব্যক্তি নিজেকে

প্রকাশিত করে। এটি সবচাইতে স্পষ্ট শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু শিল্পসাহিত্য ছাড়াও সাধারণভাবে জীবনের অন্য নানা ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও ব্যক্তিমন নিজের বিকাশকে ব্যক্ত করতে পারে। প্রকাশ ছাড়া বিকাশ অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন পরোক্ষ উপাদানকে বশে এনে ব্যক্তি আত্মপ্রকাশের নানা সম্ভাব্য রূপ উদ্ভাবন করে। প্রকাশ মাধ্যম-নির্ভর এবং মাধ্যমের সার্থক প্রয়োগপদ্ধতির নাম প্রকাশরীতি। প্রকাশরীতির চর্চা তাই ব্যক্তির বিকাশের পথে একান্ত প্রয়োজনীয়। মানবতন্ত্রী শিক্ষাদর্শে শিল্পকলার অনুশীলন যে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে, তার কারণ মানুষের অন্যসব ক্রিয়াকর্মের তুলনায় শিল্পকলার প্রকাশ-রীতি সবচাইতে বেশী সমৃদ্ধ ও পরিণত। রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী বিত্তোরিনো দা ফেল্‌ত্‌র্‌ লিখেছেন ব্যক্তিকে প্রকাশক্ষম করে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য আমরা ভুলতে বসেছি। উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তাই সৃষ্টিশীলতার চাইতে যান্ত্রিকতার লক্ষণ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে।

কিন্তু আপনাকে প্রকাশিত করার আগে আপনাকে ত সমৃদ্ধ করা দরকার। তা না হলে সে প্রকাশের কতটুকু বা মূল্য থাকবে। আত্ম-সমৃদ্ধির জন্য একধারে চাই প্রকৃতির সঙ্গে ব্যাপক এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়, অন্যধারে যত বেশীসংখ্যক মানুষ সম্ভব তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা। প্রকৃতির ঐশ্বর্য অফুরন্ত; তার কিছু-বা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে ছড়ানো রয়েছে, আর অনেকটাই রয়েছে লুকোনো, না-জানা। যা সামনে রয়েছে তাকে ভেতরে গ্রহণ করতে হবে; যা লুকোনো কি আজো অজানা, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। অজানাকে জানার জন্যে মানুষ বার বার অভিযানে বেরিয়েছে; দুর্গম পর্বতচূড়া, অন্ধকার অরণ্যানী, দূরবিস্তৃত মরুভূমি, বরফে মোড়া মেরুপ্রদেশ, গভীর সাগরতল, সীমাহীন আকাশ—কোনো কিছুকে সে অজানা থাকতে দেবে না। আর তারি সঙ্গে যা আপনা হতেই সামনে পড়ে রয়েছে,

তাকে আরো খুঁটিনাটি করে বুঝতে হবে। পায়ের নীচের ঐ অবহেলিত ঘাসফুলটির মধ্যে কত অজ্ঞাত তত্ত্ব লুকিয়ে আছে; ক্ষেতের শস্য, গাছের ফল, রোদবৃষ্টি, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, ধাতুপাথর, ধুলোহাওয়া, প্রত্যেকটি অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকে আহ্বান করছে। সে আহ্বান জানার জন্যে, ভোগ করার জন্যে। নিজের নাভীকুণ্ডের দিকে স্থিরদৃষ্টি হয়ে বসে যোগাভ্যাস করলে কোনো মানুষ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি যার আগ্রহ নেই তার বিকাশ সঙ্কীর্ণ, তার প্রকাশ দরিদ্র। [৪]

আর অপর মানুষের সঙ্গে যোগসাধন না ঘটলে আমরা ত প্রত্যেকে আজীবনকাল শুধু আপন আপন কক্ষেই ঘুরে মরতাম। অপরের অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করতে পারি বলেই না আমাদের আত্মবিকাশের কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডী নেই। প্রতি মানুষই অসামান্য, এবং প্রতি মানুষের অভিজ্ঞতা হতেই অপর মানুষের মন নিজের সমৃদ্ধি-সাধনের উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। মিশেলে লিখেছেন, 'মানুষের সমগ্র স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়াটাই হচ্ছে রেনেসাঁসের মহত্তম

॥ ৪ ॥ লেওনার্দো তাঁর নোট বইতে লিখেছেন, "প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটিত করাকে আমি আমার জীবনের ব্রত বলে জেনেছি।" অজানাকে জানবার অদম্য বাসনা কলম্বস-এর মত আরো অনেককেই ঘরছাড়া করেছিল। পেত্রার্কের "প্রকৃতির রূপ" গ্রন্থ হতে জানা যায় বহির্জগতের নানা খুঁটিনাটি তিনি কত যত্নের সঙ্গেই না লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃতির প্রতি এই আগ্রহের ফলে রেনেসাঁসের যুগে নতুন করে ভূগোলবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়; উবর্তি এবং ঈনিআস সিলভিউস এদিকে পথপ্রদর্শক। তাছাড়া জীবজন্তু, গ্রহনক্ষত্র, নদীপর্বত ইত্যাদি সম্বন্ধেও বিশদ অনুসন্ধান এইযুগে শুরু হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গতা এযুগের চিত্রকলায় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। রেনেসাঁসের প্রকৃতিপ্রীতি সম্বন্ধে সবচাইতে সুন্দর বর্ণনা আছে হুম্বোল্ট-এর বিখ্যাত গ্রন্থ "কস্‌মস্‌"-এর দ্বিতীয় খণ্ডে।

কীর্তি।" প্রতি মানুষই যে স্বতন্ত্র এবং তাদের প্রত্যেককেই পৃথকভাবে বোঝা দরকার, দান্তের মহাকাব্যে এই বোধের প্রথম পূর্বাভাস চোখে পড়ে। বোকাচ্চিও, চসার হতে শুরু করে শেক্সপীয়র পর্যন্ত রেনেসাঁসের সাহিত্য এই বোধের আলোয় সমুজ্জ্বল। রেনেসাঁসের যুগে যে জীবনী এবং আত্মজীবনীর হিড়িক দেখা যায়, এই বোধ তার উৎস। এরি তাগিদে ঐযুগে শরীরবিজ্ঞানের চর্চা সুরু হয়। লেওনার্দোর নোটবইতে উল্লেখ আছে তিনি দেহসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার জন্য গোপনে দশটি শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। মানুষ সম্বন্ধে তাঁর যে কি অক্লান্ত কৌতূহল ছিল এবং সে কৌতূহল পূরণের জন্য তিনি যে কি অমিত অধ্যবসায়ী, তাঁর অসংখ্য স্কেচগুলির মধ্যে তাব প্রমাণ আছে।

রেনেসাঁসের বহু আগে টেরেন্স লিখেছিলেন, আমি মানুষ, সুতরাং মানুষ সংক্রান্ত কোনো কিছুই আমার অনাত্মীয় হতে পারে না। টেরেন্সের এই উক্তি মানবতন্ত্রী মনোভাবের অন্যতম মূল প্রত্যয়। জ্ঞানের দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সহযোগিতার দ্বারা যত বেশী সংখ্যক মানুষ সম্বন্ধে আমরা অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারব আমাদের মন মানবীয় উপাদানে ততই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে। প্রাচীন সংস্কৃতি-সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে আমরা অতীতকালের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাই[৫]; নানাদেশ ঘুরে আমরা নানাধরনের মানুষকে আপনার

॥ ৫ ॥ অনেক ঐতিহাসিক রেনেসাঁসকে অতীত সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন বলে বর্ণনা করেছেন। এটি রেনেসাঁসের সঠিক বর্ণনা নয়; রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রীরা যদি শুধু গ্রীস রোমের অনুসরণ করতেন তবে তাঁরা কখনো আধুনিক সভ্যতার পথকর্তা হতে পারতেন না। তাহলেও একথা অবশ্যস্বীকার্য যে গ্রীস এবং রোমের প্রায়বিস্মৃত সভ্যতার সঙ্গে নতুন করে যোগসাধন হওয়ার ফলে রেনেসাঁসী উন্মেষ সহজতর এবং বলিষ্ঠতর হয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচীন ইয়োরোপীয় সভ্যতার ঐতিহ্য আরবদের মধ্যে আশ্রয় পায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়াতে সম্রাট যুষ্টিনিয়ানের আদেশে আথেন্সের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে

করি; শবব্যবচ্ছেদ করে আমরা মানুষের দেহের গঠন সম্বন্ধে বিচক্ষণ হই; সাধু, চোর, জ্ঞানী, মূর্খ, সুন্দর-কুৎসিত নির্বিশেষে বিচিত্র-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে শুধু যে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যথার্থতর হয়ে ওঠে তাই নয়, আমাদের নিজেদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিচিত্র সম্ভাবনা সার্থকতর রূপ পরিগ্রহ করে। এই অর্থে মানবতন্ত্র একই সঙ্গে বিশ্বমানবিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বিশ্ব-মানবিক, কারণ দেশকাল জাতিবর্ণের কোনো প্রাচীর মানুষ সম্বন্ধে তার আগ্রহকে ব্যাহত করতে পারে না; ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কারণ তার সমস্ত

যাওয়ায় সেখানকার গ্রীক পণ্ডিতেরা ইয়োরোপ ছেড়ে সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশে যেয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। ফলে ইয়োরোপে প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রায় লোপ পায়। পেগান আদর্শকে হটিয়ে দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের জীবনবিমুখ আত্মনিগ্রহশীল নীতিতত্ত্ব পশ্চিমী মনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। রেনেসাঁসের কিছু পূর্ব হতেই ইয়োরোপের সঙ্গে আরব সভ্যতার যোগাযোগ শুরু হয় এবং আরব সভ্যতার মাধ্যমে প্রাচীন ইয়োরোপীয় সভ্যতার কিছুকিছু নতুন করে আবার ইয়োরোপে ফিরে আসতে শুরু করে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টি-নোপলের পতনের ফলে এই প্রত্যাগমন দ্রুততর হয়ে ওঠে। রেনেসাঁসের যুগে প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান সভ্যতা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে চর্চা শুরু হয় এবং এই চর্চার ফলে মানবতন্ত্রী সাধনার প্রাচীন ঐতিহ্য নতুন করে আবিষ্কৃত হতে থাকে। রেনেসাঁসের পণ্ডিতেরা হাজার হাজার লুপ্ত প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করে প্রকাশিত করেন। এরি সঙ্গে প্রাচীন ভাস্কর্য-স্থাপত্যের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হতে থাকে। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান সংস্কৃতির মধ্যে যে মানবতন্ত্রী জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল এই আবিষ্কারের ফলে রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রীদের পরে তা স্বভাবতই গভীর প্রভাব ফেলে। রেনেসাঁসের যুগে পশ্চিমী মন যে খ্রীষ্টধর্মের হাজার বছর ব্যাপী একচেটে প্রভাবের আওতা হতে অনেকখানি মুক্ত হয়ে মানবতন্ত্রী সাধনায় আপনাকে উন্মীলিত করতে পেরেছিল, গ্রীকরোমান সভ্যতার ব্যাপক পুনরাবিষ্কার অবশ্যই তার অন্যতম প্রধান কারণ। স্যাণ্ডিন্ সাহেবের "এ হিষ্টরি অব্ ক্ল্যাসিক্যাল স্কলারশিপ" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তর তথ্য একত্রিত করা আছে।

প্রয়াসের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য ব্যক্তি-মানুষকে বিকশিত করা, কারণ ব্যক্তির বিকাশই তার বিচারে সার্থকতার একমাত্র মানদণ্ড।

চার

রেনেসাঁসের সাধনার এই হ'ল মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এ পরিচয়ের মধ্যে অনেকগুলি ত্রুটি রয়ে গেছে; তার কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার মনে করি। প্রথমতঃ, মানবতন্ত্রের সব দিক এখানে উল্লেখ করা হয় নি; আমি শুধু কয়েকটি প্রধান সূত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছি। উল্লিখিত দিকগুলি ছাড়াও মানবতন্ত্রের আরো অনেক দিক আছে, এবং কেউ যদি আমার বর্ণনা হতে মানবতন্ত্রের একটা পুরো ছবি পেয়েছেন মনে করেন তবে তিনি মস্ত ভুল করবেন। দ্বিতীয়ত, মানবতন্ত্র কোনো একটা সুপরিকল্পিত দার্শনিক মত হিসেবে গড়ে ওঠে নি; রেনেসাঁসের কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দল বা প্রতিষ্ঠান মানবতন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যয়গুলিকে ভেবেচিন্তে একটা সমগ্র মতবাদের মধ্যে গ্রথিত করেন নি। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে, ক্রিয়া-কলাপে এবং রচনায় এইসব প্রত্যয় ধীরে ধীরে রূপপরিগ্রহ করেছিল। ফলে রেনেসাঁসের যুগে এমন অনেক মানবতন্ত্রী চোখে পড়ে যাঁরা মানবতন্ত্রের কোনো কোনো প্রত্যয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, অথচ অন্য প্রত্যয়গুলি তাঁদের ওপরে তেমন প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে নি। শুধু তাই নয়, পরিবেশ ও ব্যক্তিত্বের প্রভেদের ফলে এমনও দেখা যায় যে এক মানবতন্ত্রী এবং অন্য মানবতন্ত্রীর মধ্যে বহুক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিরোধ বর্তমান। যেমন ধরুন, ফ্লোরেন্সের মানবতন্ত্রীরা ঝোঁক দিয়েছেন শুধু মাত্র ব্যক্তির বুদ্ধি এবং অনুভূতির সূক্ষ্মতা সাধনের ওপরে; ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব তাঁরা একরকম অবহেলা করেছেন। অন্যধারে পাদুয়ার মানবতন্ত্রীরা বেশী জোর দিয়েছেন সহৃদয়তা গুণেরও পরে;

কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি বা সৌন্দর্যবোধ খুব সূক্ষ্ম না হলেও তাঁর ব্যবহারে যদি সংযম, দয়াদাক্ষিণ্য, সততা ইত্যাদি গুণ থাকে তবে তিনি আদর্শ নাগরিক। তেমনি, এরাজ্‌মুস্‌ এবং মেকিয়াভেল্লীর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। তৃতীয়ত, রেনেসাঁসের সব মানবতন্ত্রী কিছু আর আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য হতে পুরোপুরি মুক্তিলাভ করেন নি। তাঁদের অনেকেরই আচার-ব্যবহার-চিন্তার ওপরে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব কমবেশী বর্তমান। লেওনার্দো, মেকিয়াভেল্লী, মনতেন প্রমুখ কয়েক-জনকে বাদ দিলে সম্পূর্ণ লোকায়ত দৃষ্টিসম্পন্ন মানবতন্ত্রী রেনেসাঁসের যুগেও খুব বেশী মিলবে না। তবে একথাও সত্য যে রেনেসাঁসের প্রায় কোনো মানবতন্ত্রীর মনেই এই আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য দৃঢ়মূল ছিল না এবং রেনেসাঁসের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী যতই স্পষ্টতা অর্জন করেছে, আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য ততই দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে এসেছে।

বর্তমান প্রবন্ধে রেনেসাঁসী সাধনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার এই ত্রিবিধ অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে নিয়েও একথা বলা যায় যে উপরোক্ত বর্ণনা মোটামুটি যথার্থ এবং রেনেসাঁসের তিন শতক ধরে আধুনিক মনের যে ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই বর্ণনার মধ্যে তার অধিকাংশ প্রধান সূত্রের পরিচয় মিলবে। এই সূত্রগুলি পরস্পরে মিলিত হওয়ার ফলে একটি সমগ্র জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল এবং যদিচ রেনেসাঁসের পথকর্তারা সকলে এ বিষয়ে সমান সচেতন ছিলেন না, তবু একধারে সেই জীবনদর্শন তাঁদের যুগকে পূর্ববর্তী প্রায় সহস্র বৎসরের ইতিহাস হতে পৃথক করেছে, অন্যধারে তাকে আশ্রয় করেই আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিবর্তন সম্ভবপর হয়েছে। এই জীবনদর্শনের উষাকালে তার এককণা আলো বৈজান্তীয়, রোমানেস্ক এবং গথিক প্রকাশরীতির ব্যূহ ভেদ করে তের শতকের শেষ দশকে জ্যোত্তোর কল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছিল আর তারপর তিনশ' বছরে কি রূপান্তরই না সাধিত হল ইয়োরোপের চিত্রকলায়। উচ্চেল্লো আনলেন

পরিপ্রেক্ষিতবোধ, পোল্লেউংলো আনলেন নগ্ন মানবদেহের অঙ্গ-সংস্থানজ্ঞান ; আর সেই বোধ, সেই জ্ঞান সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যে সার্থক প্রকাশ পেল লেওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলোর চিত্রে, ভাস্কর্যে। রেনেসাঁসের শিল্পীরা বিভিন্ন রীতির সাধক, একই যুগে বাস করা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে স্থূল-সূক্ষ্ম বিচিত্র রকমের পার্থক্য বিদ্যমান। ফান্ আইক, মান্তেনা, বেলিনী, ডুয়েরার, টিৎজিয়ানো, রাফাএলো প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী। তবু এঁদের সকলের সাধনার মধ্যে একটি মূল ঐক্যের উপস্থিতি চোখে না পড়ে পারে না এবং সে ঐক্য মানবতন্ত্রী জীবনদর্শনের। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ যে কত বিচিত্র, কত সুন্দর, মানুষের দেহমন যে কি অফুরন্ত রহস্যের আধার, এই মানবতন্ত্রী উপলব্ধি তাঁদের শিল্পকল্পনাব অন্যতম মূল উৎস। এই জীবনদর্শন পেত্রার্ককে পূর্ববর্তী কবিদেব থেকে পৃথক করেছে ; এবি প্রেরণায় বেনেসাঁসেব সাহিত্যিকেরা ক্রমে লাতিনের আওতা ছেড়ে দেশজ ভাষায় লিখতে শিখেছেন ; এরই বিস্ময়কর বহুমুখী প্রকাশ বোকাচ্চিওর দেকামেরনে, মাকিয়াভেল্লীব প্রিন্স্-এ, কাস্তিলিওন্-এব কোর্টিয়ারে, আবিওস্তোর অর্লান্দো ফুরিওসো কাব্যে, এরাজ্মুস-এর প্রেজ অব্ ফলিতে, রাবেলে-ব গারগাঁতুয়া ও পাঁতা-গ্রুয়েল-এর আজব কাহিনাতে, মনতেনের প্রবন্ধাবলীতে, সর্ভান্তেস-এব ডন কীজোট উপন্যাসে, শেক্সপীয়রের নাটকে এবং কবিতায়। রেনেসাঁসেব লিরিক কবিতা, নাটক প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, অর্থাৎ সাহিত্যের সব কটি প্রধান ক্ষেত্রই মানবতন্ত্রেব কোনো না কোনো দিকেব আলোতে উদ্ভাসিত। রেনেসাঁসের যুগে যাকে "বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব" বলা হত—তাব মধ্যে এ জীবনদর্শনের সার্থকতম রূপায়ণ দেখতে পাই। যে মানুষদের মধ্যে এই বৈশ্বিকতা স্ফুরিত হয়েছিল তাঁরা ছিলেন একই সঙ্গে কবি, চিত্রকর, সুরজ্ঞ, ভাস্কর, আইনবিশারদ, পদার্থবিদ, রাসায়নিক, ব্যায়ামকৌশলী, যোদ্ধা, এবং খাদ্য, সুরা ও সম্ভোগশাস্ত্রে সুরসিক—অর্থাৎ জীবনের প্রায় এমন কোনো দিক ছিল না

যার এঁরা অনুশীলন করেন নি এবং অনুশীলনের ফলে যেদিকে এঁরা পারদর্শী হন নি। প্রতি মানুষের মধ্যে যে কত সম্ভাবনা নিহিত আছে, এঁদের সার্থকায়িত জীবন তারি প্রমাণ। বুর্কহার্ট এমনি বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বের উদাহরণ হিসেবে লেওন বাতিস্তা অলবর্তি-র নাম উল্লেখ করেছেন। অলবর্তি-তে যে বিকাশের সূচনা তারি সুপরিণত প্রকাশ লেওনার্দো দা ভিঞ্চির ব্যক্তিত্বে। লেওনার্দোর প্রতিভার তুলনা নেই; কিন্তু যে বৈশ্বিকতা সে প্রতিভার বৈশিষ্ট্য রেনেসাঁসের যুগে আরো অনেকের মধ্যেই তা কমবেশী বিকশিত হয়েছিল।

রেনেসাঁসের তিনশ' বছর ধরে পশ্চিম ইয়োরোপে যে জীবনবোধ জেগে উঠেছিল, পরবর্তী তিনশ' বছরে তা ক্রমে বিকাশ এবং বিস্তার লাভ করেছে। এই বিকাশের পথে গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিজ্ঞান এবং যন্ত্রশিল্প, আধুনিক শিল্পকলা এবং সাহিত্য, শিক্ষাপদ্ধতি এবং নীতিবোধ—এক কথায় আধুনিক সমাজ এবং সংস্কৃতি। দেকার্ত্-লক-কাণ্ট-রাসেল এই রেনেসাঁসী জীবনবোধের দার্শনিক উত্তরসাধক; গ্যয়টের জীবনশিল্প এই সাধনারই প্রতিচ্ছবি; ফরাসী এনসাইক্লোপেডিস্ট এবং ইংরেজ র‍্যাডিক্যালদের সমাজসংস্কার আন্দোলন এই বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ; দাসপ্রথার উচ্ছেদ এবং শ্রমিক ও স্ত্রীলোক-দের রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ এই বোধেরই সামাজিক সার্থকায়ণ; বলজাক-স্তাঁদালের উপন্যাস, দেগা-সেজানের চিত্রকলা, বেটোফেনের সঙ্গীত, ইবসেনের নাটক, রোদ্যাঁর ভাস্কর্য, চেহফের গল্প, মন্তেসেরীর শিক্ষাপদ্ধতি, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ, জুলিয়ন হাক্সলী-এরিক ফ্রোমের নীতিবিচার—এ সবই ওই জীবনবোধের বিচিত্র প্রকাশ। আধুনিক সভ্যতার অন্তরে যে মহৎ প্রতিশ্রুতি বর্তমান তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে তাই এই জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস শুধু রেনেসাঁসী সাধনার

সার্থকায়ণের ইতিহাস নয়। সে সাধনা পদে পদে ব্যাহত হয়েছে, সে জীবনবোধের বিকাশ এবং বিস্তারের পথে বহু দুস্তর প্রতিবন্ধক দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ মানুষের মন আজও প্রাক্‌রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের দ্বারা আচ্ছন্ন; বুদ্ধির চাইতে অভ্যাসাশ্রয়ীতা, জ্ঞানের চাইতে অন্ধভক্তি আজো তাদের জীবনে বেশী প্রভাবশীল; নিজের ভাগ্যরচনার দায়িত্ব নিজেরই হাতে তুলে নেবার প্রত্যয় আজো তারা অর্জন করে নি। মানুষের জড়বুদ্ধি আজো আধ্যাত্মিকতার মুখোশের আড়াল হতে বহু মানুষের জীবন পরিচালিত করছে। তাছাড়া শিল্পসাহিত্য এবং পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসী সাধনা বহুদূর অগ্রসর হলেও সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে সে সাধনা আজো যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে নি। কিছুটা সুফল অবশ্যই ফলেছে, নইলে ইংলণ্ডে আজ শ্রমিকসংগঠন এত ক্ষমতাশালী হতে পারত না, মার্কিনে দাসপ্রথার উচ্ছেদ ঘটত না, পৃথিবীর এতদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা সম্ভব হত না, হিন্দুসমাজের এতদিনের পুরোণো বর্ণভেদ প্রথায় ভাঙন ধরানো অসম্ভব হত। তবু যা ঘটেছে তা সামান্য; বিস্তর গলদ আজো রয়ে গেছে। এসব গলদের কিছুবা অতি প্রাচীন, কিছু আধুনিক সভ্যতার নিজেরই সৃষ্টি। ধর্মান্ধতা, জাতীয়তা, সাম্রাজ্যতন্ত্র, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিবন্ধকের ফলে মানবতন্ত্র আজো একটি বিশ্বমানবীয় সভ্যতায় সার্থকায়িত হয়ে উঠতে পারল না। তাছাড়া গত একশ' দেড়শ' বছরের মধ্যে নতুন দুটি বাধা অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। একধারে যন্ত্রের দ্রুত প্রসারের ফলে মানুষের জীবন অত্যন্ত যন্ত্রনির্ভর এবং মানুষের মন মারাত্মক ভাবে যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। যান্ত্রিকতার ফলে মানুষের প্রাতিস্বিক সত্তায় ভাঙন দেখা দিয়েছে; তার বুদ্ধি, মুক্তিস্পৃহা এবং সৃষ্টিক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসছে। অন্যধারে রাজনৈতিক জীবনে জনতার অংশ ক্রমেই স্বীকৃত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের হাতে সমাজজীবনের অধিকাংশ শক্তি এবং দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তার ফলে একধারে ব্যক্তির সামর্থ্য যত কমে

আসছে, যূথবৃত্তি ততই প্রবলতর হয়ে উঠছে আর রাষ্ট্রের ক্ষমতা তত বেড়ে চলেছে। এই দুইধারার মিলন হতে জন্ম নিয়েছে এ শতাব্দীর সার্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার অর্থ মানবতন্ত্রী সাধনার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন। অথচ মানবতন্ত্রী সাধনার যথার্থ সার্থকায়ণের জন্য যন্ত্রের প্রসার এবং সর্বসাধারণের রাষ্ট্রিক সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যন্ত্র অথবা জনতা কোনোটি হতে মুখ ফেরালে মানবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। মানুষের বিকাশের জন্য যন্ত্রকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যন্ত্রপাতি মানুষের প্রভু না হয়ে ওঠে, মানুষের মন যাতে যান্ত্রিক না হয়। তেমনি সমাজজীবনে সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে এই প্রতিষ্ঠার পথে রাষ্ট্র বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রচুর শক্তির যেন কেন্দ্রীকরণ না ঘটে, ব্যক্তি সত্তা যেন যূথসত্তার মধ্যে বিলুপ্ত না হয়। রেনেসাঁসের আজ যাঁরা উত্তর সাধক এ সমস্যার সমাধান তাঁদেরই ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সে দায়িত্ব যদি তাঁরা পালন করতে পারেন, তবে ভবিষ্যৎ কালের ঐতিহাসিকেরা বিংশ শতাব্দীকে এক অভিনব বিশ্বব্যাপী রেনেসাঁসের সূচনাকাল বলে স্মরণ করবেন। আর তা যদি তাঁরা না পারেন তবে পৃথিবীতে এমন এক অন্ধকার যুগ দেখা দেবে অতীতে যার তুলনা মেলা কঠিন এবং যার সমাপ্তি যে কবে বা কোথায় আজ তা কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব।

ক্লাসিক ও রোমান্টিক

ক্লাসিক এবং রোমান্টিক এই শব্দটির কোন যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ আছে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। কোন কোন লেখক ক্লাসিকের তর্জমায় ধ্রুপদী এবং রোমান্টিকের তর্জমায় খেয়ালী শব্দ দুটি ব্যবহার করে থাকেন। আমি নিজেও আমার পূর্বকার কোন কোন রচনায় ঐ প্রতিশব্দ দুটি ব্যবহার করেছি। কিন্তু ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে পাঠ, চিন্তা এবং আলোচনার ফলে ক্রমশঃই আমার মনে এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়মূল হয়েছে যে ভাষান্তরের ফলে ঐ শব্দদুটির অর্থসমৃদ্ধি খণ্ডিত হবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশী। সুতরাং আমার প্রস্তাব, ক্লাসিক এবং রোমান্টিক শব্দদুটিকে অবিকৃত অবস্থায় আমাদের ভাষায় আত্মস্থ করে নেওয়া হোক।

ক্লাসিকের ধ্যেয় রূপ, রোমান্টিকের সাধনা প্রকাশ। ক্লাসিক মানস ঐতিহ্যের অনুকর্ষে মাজিত, রোমান্টিক মানস স্বকীয়তার স্বাক্ষরে সিদ্ধিকামী। ক্লাসিক শিল্পী হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় আকাশ হতে দৈবীরূপ ধ্যানযোগে আকর্ষণ করে নিজের চিত্তলোকে প্রত্যক্ষ করেন; তাতে তাঁর চিত্ত সংস্কৃত হয়, অহং-এর সামান্যতা হতে সত্তার মুক্তি ঘটে। এই রূপ অজর, অব্রণ এবং আত্মসম্পূর্ণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধ্যমে ধ্যানধৃত রূপকে আকার দেওয়া ক্লাসিক শিল্পের একাগ্র সাধনা। এই রূপের অপরোক্ষানুভূতিই প্রকৃত সমাধি। অর্থাৎ ক্লাসিক শিল্পীর বিচারে তাঁর প্রাতিস্বিকতা নির্মূল্য, এমন কি তাঁর শিল্পসাধনায় বাধা মাত্র। রূপের ধ্যানে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের দ্বারা তাঁর ব্যক্তিসত্তা সংস্কৃত এবং সার্থক হয়ে ওঠে।

রোমান্টিক মানস ঠিক এর বিপরীত। রোমান্টিকের দৃষ্টিতে সব অর্থসমৃদ্ধ প্রচেষ্টার মূল উৎস ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববোধে। সেই কাজেরই শুধু

অর্থ আছে যার ভিতরে কর্তার ব্যক্তিত্ব স্ব-প্রকাশ। শিল্পে শিল্পী আপনার বিশিষ্ট সত্তাকে নানা পরোক্ষ মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। শিল্পের মধ্যে ব্যক্তি আপনার বিশেষ এবং অদ্বিতীয় অস্তিত্বের স্বাক্ষর রাখেন বলেই না শিল্পরচনা মূল্যবান। রোমান্টিকের শ্রেয় চিত্তের সংস্কার নয়, চিত্তের মুক্তি। ক্লাসিক মন যে রূপকে স্থানকালপাত্রোত্তীর্ণ বলে কল্পনা করে, রোমান্টিক মন তাকেই বিশেষকালে বিশেষস্থানে বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি বলে নিশ্চিত জানে। রোমান্টিক তাঁর অহংকে নিয়ে এতটুকু অপ্রতিভ নন। বরং এই অহং যে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার উৎস এ বিশ্বাসে তিনি রীতিমত গর্বিত এবং উৎফুল্ল বোধ করেন।

অর্থাৎ ক্লাসিক সাধনার সিদ্ধি হ'ল নিত্যরূপের মধ্যে প্রাতিস্বিকের নির্বাণে আর রোমান্টিক উদ্বেগের পরিতৃপ্তি হল ব্যক্তির প্রকাশপ্রচেষ্টার ওপর হতে সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণের বিলোপে। উভয়েরই উদ্ভব দ্বৈতে, সার্থকতা অদ্বৈতে। সার্থকতা, এবং একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বিলয়ও বটে।

সুতরাং ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের প্রভেদ যে মৌলিক তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং মৌলিক বলেই তা বিস্তৃত ও দূরপ্রসারী। সচেতন কার্যকলাপের যে কোন ক্ষেত্র বিচার করলে এই প্রভেদ নজরে পড়বে। ক্লাসিক-রুচি দর্শনের আদর্শ গাণিতিক প্রত্যয়; রোমান্টিক বিশ্ববীক্ষার কেন্দ্রে আছে জৈব অভীপ্সা। ক্লাসিক নীতিশাস্ত্রের মূল কথা নিয়মনিষ্ঠা; রোমান্টিক শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিবেকবোধ ছাড়া অন্য কোন মানদণ্ড স্বীকার করেন না। ক্লাসিক সমাজতত্ত্ব ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দেয়। রোমান্টিক সমাজতত্ত্বে ব্যক্তিই উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠান বিধেয়-মাত্র। ক্লাসিক দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রতি নিরভিমান আনুগত্যে নাগরিকের কল্যাণ। অপরপক্ষে রোমান্টিক দাবী করেন যে, রাষ্ট্রের কোন মূল্যই নেই যদি না তা নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

দেকার্তে এবং নীট্‌শে, কাণ্ট্‌ এবং কীর্কেগাআর্ড, কুংফুৎসে এবং ক্রোপট্‌কিন্‌, হেগেল এবং হর্বর্ট রীড—এঁদের মাঝখানে যে ব্যবধান তা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য। ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের মধ্যে পারস্পরিক মন-জানাজানির অবকাশ ক্বচিৎ। কারণ ক্লাসিক রোমান্টিককে অবজ্ঞা করেন অপরিণতবুদ্ধি বলে, আর রোমান্টিক ক্লাসিককে বর্জন করেন জীবন্মৃত এই ধারণায়।

দুই

এ পর্যন্ত আমরা ক্লাসিক এবং রোমাণ্টিকের বিভেদতত্ত্বই শুধু আলোচনা করেছি। পার্থক্য পরিস্ফুট করার জন্য স্বভাবতঃই আমাদের বিশুদ্ধ ক্লাসিক এবং বিশুদ্ধ রোমাণ্টিক চরিত্র কল্পনা করতে হয়েছে। মোটমাট সে পার্থক্য পরিস্ফুট হয়েছে ধরে নিলে অতঃপর এ সত্য স্মরণ করার প্রয়োজন আছে যে সব বিশুদ্ধ চরিত্রের মত এ দুটিও বিমূর্ত কল্পনামাত্র। কারণ যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই মিশ্রিত এবং নিষ্কলুষ বিশুদ্ধতা একমাত্র গণিতেই সম্ভব।

সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার স্তরে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আমূল বিরোধ সত্ত্বেও মানুষের জীবনে, চিন্তায়, ক্রিয়াকর্মে ক্লাসিক এবং রোমাণ্টিক নানা রূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে। কোন বিশেষ মিশ্রণে-বা ক্লাসিক মেজাজের প্রভাব বেশী প্রবল, কোনটিতে-বা রোমাণ্টিকের। বস্তুতঃ আমরা যখন কোন ব্যক্তি, রচনা কিংবা আন্দোলনকে ক্লাসিক কি রোমাণ্টিক আখ্যা দিই, তখন আমরা ঐ বিশেষ মিশ্রণের ক্ষেত্রে মেজাজটির আপেক্ষিক প্রভাবের কথাই উল্লেখ করে থাকি। সেই মিশ্রণই ক্লাসিক যাতে প্রকাশ অপেক্ষা রূপের, অভীপ্সা অপেক্ষা যুক্তির, অভিনবত্ব অপেক্ষা ঐতিহ্যবোধের প্রভাব প্রবলতর। অপরপক্ষে সেই মিশ্রণই রোমাণ্টিক যাতে যুক্তি অপেক্ষা

আবেগের, রেখা অপেক্ষা রঙের, আকার অপেক্ষা গতির, ঐতিহ্য অপেক্ষা প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর প্রধান।

মানুষের জীবনে ক্লাসিক এবং রোমাণ্টিকের এই মিশ্রণ মোটেই আকস্মিক নয়। বরং একটু লক্ষ্য করলে চোখে পড়বে এই মিশ্রণ মানবসত্তায় অন্তর্নিহিত বলেই মানুষের বহুমুখী বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের কি ব্যক্তিগত কি সমাজগত বিকাশের মূলসূত্র দুটি : মুক্তি এবং জ্ঞান। প্রতি মানুষের মধ্যেই বহুমুখী সম্ভাবনা নিহিত আছে। এই সব সম্ভাবনার বাস্তবীকরণের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি বারবার নিজেকে সৃষ্টি করে। এর পথে ভিতর-বার মিলিয়ে বাধা অনেক। ব্যক্তির চারধারে পরিবেশ লক্ষণের গণ্ডী টেনে দিয়েছে—গণ্ডী লঙ্ঘন করলেই সতীত্ব লোপের ঘোর আশঙ্কা। ভিতর হতেও নিষেধ কি কম—আলস্য, ভয়, মোহ, নিয়ম-নিষ্ঠা, সংস্কারের উত্তরাধিকার মনকে পিছুটানে টেনে রেখেছে। এই গণ্ডী ভেঙে, সেই পিছুটান কাটিয়ে তবু যে মানুষ নবনব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আপনাকে বিচিত্ররূপে বিকশিত করতে পারল তার কারণ মুক্তির কামনা এবং সত্যানুসন্ধিৎসা মানুষের সত্তায় একান্তই ওতঃপ্রোত। ব্যক্তি তার জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তকেই নিত্য এবং চরম বলে মেনে নিতে পারে না। যারা মেনে নেয় বা মেনে নেবার চেষ্টা করে তারা ধীরে ধীরে আপনাদের মনুষ্যত্ব খুইয়ে ফেলে। যা-আছে তাকেই শেষ কথা বলে মেনে না নিয়ে তা হতে ঐশ্বর্যবান যা-হতে-পারে তারই রূপায়ণের মধ্যে ব্যক্তির মুক্তি। বাস্তব হতে সম্ভবে পৌছনোর যে আকুতি তা হতে রোমাণ্টিক মেজাজের উদ্ভব। অর্থাৎ রোমাণ্টিকতা মানুষের স্বধর্ম।

কিন্তু এই যে যা-হতে-পারে, যা সম্ভব, যার রূপায়ণের মধ্যে সত্তার মুক্তি, তাকে জানবার, তাতে পৌছবার উপায় কি? উপায় বুদ্ধি, সত্যসন্ধিৎসা, জ্ঞান। মুক্তির অভীপ্সা আশ্রয় পায় সত্যের অনুসন্ধানে এবং এই সত্যানুসন্ধিৎসাই ক্লাসিকতন্ত্রের আত্মা।

মুক্তি এবং যুক্তি, বিকাশ এবং জ্ঞান যে নিতান্ত অচ্ছেদ্যভাবেই পরস্পরনির্ভর সামান্য বিচার করলেই তা চোখে পড়ে। যে অন্তর্নিহিত নিত্যসত্তার সম্পদে ব্যক্তি একাধারে স্বকীয়তা এবং বিশ্বমানবত্বে বিত্তবান সাময়িক প্রকাশের সামান্যতায় সে সম্পদ অনেক সময়েই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সাময়িক রূপের প্রতি মোহ্ ব্যক্তির বিকাশের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। যুক্তি বা সত্যানুসন্ধিৎসা মনকে এই মোহ হতে মুক্ত ক'রে তার নিত্যসত্তা বিষয়ে সচেতন করে তোলে। এই চেতনা দুর্বল বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে ব্যক্তির ভিতরে মুক্তির তাগিদ স্তিমিত হয়ে আসে। ব্যক্তি তখন যা-আছে তাতেই তৃপ্তি বোধ করে। তার রুচি শুধু পুনরাবৃত্তিতে আরাম পায়। যে নাচিকেত ওডিসি মানুষের স্বধর্ম তাকে অতি সযত্নে পরিহার করে মানুষ তখন তামসিক জাড্যে আশ্রয় খোঁজে। বন্ধ্যা আত্মতৃপ্তির মেদভারে সত্তার বিকাশ তখন স্তব্ধ, প্রাণ তখন আর প্রকাশের আক্ষেপে নবনবরূপে স্ফুরিত হয় না, মুক্তির নির্দিগন্ত স্বপ্ন অবসিত হয় আয়েসী অভ্যাসের বিজ্ স্তণে।

মানুষের এই আত্মহত্যা হতে তাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সত্যনিষ্ঠা। সত্য নির্মোহ আর সত্যানুসন্ধানের কোন সমাপ্তি নেই। কোন প্রাপ্তিতে পৌঁছে সে বলে না: এই যথেষ্ট, অতঃপর জিজ্ঞাসা অর্থহীন। তার কঠিন নির্দেশ: নেতি, নেতি। যত দিন না জরা নামে, যতদিন না মৃত্যু ঘটে, ততদিন খোঁজার অবসান নেই আর ফুটে ওঠারও শেষ নেই। পদ্ম ত' শতদল, কিন্তু আত্মার পাপড়ি সংখ্যাহীন। একটি পাপড়ি, একটি প্রাপ্তি, একটি রূপের মধ্যেই সত্তার উন্মোচন যাতে স্তব্ধ না হয়ে যায়, একটি ভঙ্গির রেখাতেই যাতে প্রাণের স্ফূর্তি অবসিত না হয়, একটি প্রত্যয়ের যাদুতেই যাতে সব জিজ্ঞাসার সংবেশন না ঘটে, তারি জন্যে কোজাগরী পাহারায় বসেছে মানুষের সত্যাগ্রহ। জিজ্ঞাসার শিখা নিভলে প্রকাশের আলোও মুছে যাবে। সত্যের অনুসন্ধানে সত্তার মুক্তি।

নিত্যসত্তা কথাটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করি। নিত্য কথাটি এখানে অজর, অমর, স্থানকালপাত্রোত্তীর্ণ কোন ব্রহ্মত্বের সংজ্ঞা হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। আমি যে নিত্যের কথা বলছি তা নিতান্তই দেহাশ্রয়ী, স্থানকালপাত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট, প্রাকৃতিক পরিবর্তনধর্মের অধীন। অর্থাৎ তার নিত্যতা আপেক্ষিক। ব্যক্তির দেহই তার সত্তা। দেহ তাকে জগৎ হতে পৃথক করে এবং দেহই তাকে জগতের সঙ্গে যুক্ত করে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ত ক্ষয়সৃষ্টিশীল দেহই ব্যক্তির অস্তিত্বগত ঐক্যের একমাত্র অবলম্বন। ব্যক্তির জীবনে অসংখ্য অমেয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐক্য তাকে ব্যক্তিসংজ্ঞার অধিকারী করে, যে ঐক্যের নিয়মে তার বিচিত্র বহুবাচনিক আকাঙ্ক্ষা অভীপ্সারাশি সৌষম্যের সন্ধানী হয়, যার উপস্থিতির ফলে ব্যক্তি একাধারে অন্যান্য ব্যক্তি হতে স্বতন্ত্র এবং অন্যসব ব্যক্তির সঙ্গে একই মনুষ্যত্বের অংশভাক্—ব্যক্তি-অস্তিত্বের সেই নিগূঢ় ঐক্যকেই আমি তার নিত্যসত্তা বলে অভিহিত করেছি। এই সত্তা বিশ্বপ্রকৃতির অংশ এবং প্রকৃতির নিয়মকে অতিক্রম করা তারও অসাধ্য। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকে মেনে নিয়ে, তারই উপাদান-সম্পদকে আশ্রয় করে, সেই উপাদানের উপরে নিজের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট ঐক্যের স্বাক্ষর রাখা এ সত্তার সামর্থ্যাধীন। সেই স্বাক্ষরের প্রকাশ মানুষের সমাজ-সভ্যতা, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-প্রতিষ্ঠান।

সত্যজিজ্ঞাসা একধারে যেমন ব্যক্তির জীবনে তার স্বকীয় নিত্য-সত্তার চেতনা আনে অন্যধারে তেমনি বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে তার জ্ঞানকে ক্রমশঃই অধিকতর ব্যাপক, গভীর এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। ব্যক্তিসত্তা এবং বিশ্বপ্রকৃতির এই জ্ঞানগত সংযোগ হতেই রূপের উদ্ভব। প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাই তা নিরূপ, নিঃসীম। অপর পক্ষে প্রকৃতির উপাদান অভাবে চেতনাও নিরাকার, নিরলম্ব। চেতনাধর্মী সত্তা এবং উপাদানসম্পন্ন প্রকৃতির সঙ্গমে রূপ এবং অর্থের

জন্ম। রূপ এবং অর্থকে আশ্রয় করে সত্তা প্রকাশ লাভ করে। প্রকাশে ব্যক্তির মুক্তি এবং যে-রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ সম্ভব হয় তা সত্য-সন্ধিৎসার ফসল।

তিন

ইতিপূর্বে বলেছি ব্যক্তির নিত্যসত্তায় একাধারে তার প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য এবং তার বিশ্বমানবতা আধৃত হয়েছে। একদিকে প্রতি মানুষই যেমন অন্যসব মানুষ হতে স্বতন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি সব মানুষই শেষ পর্যন্ত মানুষ। স্থানকালপাত্রগত পার্থক্য সত্বেও সব যুগের সব দেশের মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যধর্মের ঐক্য আছে সেটিই ব্যক্তির বিশ্বমানবতা। এই বিশ্বমানবত্ববোধ জাগ্রত না হলে ব্যক্তির স্বকীয়তা বিকাশ পায় না। ব্যক্তি যখনই স্বাতন্ত্র্য চর্চার নামে নিজের চারধারে অভ্যাসের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর খাড়া করে তখনি তার মুক্তির সম্ভাবনা সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। কারণ মানবীয় ঐক্যবোধের দ্বারা আমরা সব দেশকালের অন্তর্গত নরনারীর অমেয় সম্ভাবনা-সম্পদকে আমাদের আপন আপন ব্যক্তিসত্তার অঙ্গীভূত করতে পারি। কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে আমার সত্তার রূপধৃত উন্মোচন যে স্তরে বর্তমান তাহ'তে সম্পন্নতর উন্মোচনে উত্তীর্ণ হওয়াতেই আমার সত্তার মুক্তি। এ সমৃদ্ধি তখনি ঘটে যখন আমি আমা হতে স্বতন্ত্র অথচ মনুষ্যধর্মে আমার সরিক অন্য মানুষদের সম্ভাবনা বৈচিত্র্যকে আমার প্রাতিস্বিক ঐক্যে আত্মস্থ করতে সক্ষম হই। যে মানুষের মনে আপনার নিত্যসত্তা বিষয়ে বোধ যথেষ্ট জাগ্রত হয় নি, বিশ্বমানবতার প্রস্তাবে সে মানুষ স্বভাবতই সন্ত্রস্ত বোধ করে। কিছু যে গুণী স্বকীয় সাত্বিক ঐক্যে প্রত্যয় অর্জন করেছেন, বসুধার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন তাঁর সহজ ধর্ম। ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি বা নির্দিষ্ট স্থানকালের সঙ্কীর্ণ পরিধির ভিতরে সে মানুষ নিজের

বিকাশকে সঙ্কুচিত করতে নারাজ। স্বকীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠ বলেই সর্বজনীনে তাঁর আনন্দ।

সত্যসন্ধিৎসা যেমন স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা হতে বিশ্বমানবত্বে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটায়, তেমনি তার আভ্যন্তরীন বহুমুখীনতায় ঐক্যের সঞ্চার করে। বিকাশের পথে এ ঐক্য নিতান্ত আবশ্যিক। আমাদের দেহ-মন নিয়তই নানা আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনার আঘাতে উৎক্ষিপ্ত। তার একটিকে প্রাধান্য দিলে অন্যগুলি পীড়া দিতে থাকে। তাদের প্রত্যেকের নির্দেশ ভিন্নভিন্নমুখী। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য না আনতে পারলে সত্তার বিকাশ অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ বিকাশের একটি অন্তর্নিহিত নির্দিষ্ট ঐক্য থাকে—লক্ষ্যহীন ঘটনাস্রোত নিরর্থ পরিবর্তন মাত্র। এই আত্মবিরোধী বহুমুখীনতার মধ্যে ব্যক্তির নিত্যসত্তাবোধ সুসামঞ্জস্য এবং বিকাশধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটায়। নিত্যসত্তার কষ্টিপাথরে যাচাই করে ব্যক্তি বুঝতে পারে বিভিন্ন অনুভূতি এবং বাসনার ভিতরে কোনটি প্রধান এবং কোনটি অপ্রধান, কোনটি সামগ্রিক বিকাশে অপরিহার্য এবং কোনটি বিকাশের পথে বাধা। এই বিচার হতেই ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, প্রকৃষ্ট-নিকৃষ্টের নীতিনিয়মগুলির উদ্ভব। যা ব্যক্তির নিত্যসত্তার বিকাশে সাহায্য করে তাই শ্রেয়, যা সে বিকাশ প্রতিহত করে তাই অপকৃষ্ট। যে কামনা বা আবেগ সত্তার অন্তস্থল হতে উৎসরিত তার নিরোধে বা অস্বীকারে ব্যক্তির কল্যাণ নেই। সে নিরোধের ফলে যদিবা সাময়িক ঐক্য আসে, সে ঐক্যে ব্যক্তির স্ফূর্তি ঘটে না। ঐক্যহীন বিকাশ অসম্ভব, কিন্তু মূল কোন মানবীয় বৃত্তিকে দমন করে যে ঐক্য তা বিকাশবিরোধী এবং সে হেতু নিষ্ফলা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সত্যসন্ধিৎসা ব্যক্তির জীবনে নিত্যসত্তার চেতনা আনে, বিশ্বমানবতা-বোধ জাগিয়ে তোলে, প্রকৃতির সঙ্গে মনের সাযুজ্য ঘটিয়ে নবনব রূপের সন্ধান দেয় এবং ব্যক্তি-অস্তিত্বের বহুবাচ-

নিকতার ভিতরে সার্থক সঙ্গতির প্রতিষ্ঠা করে। সত্যসন্ধানের আশ্রয় বুদ্ধি, তার ফসল জ্ঞান, তার নাচিকেত ধর্মে ক্লাসিক এবং রোমান্টিকের সার্থক মিলন। অন্বেষণ অমিত, আত্মোদ্‌ঘাটনেরও শেষ নেই—তাই এ সাধনা রোমান্টিক। অন্যধারে যুক্তির নির্দেশ অমোঘ এবং তার অনুশীলনে সত্তা সংস্কৃত হয়—তাই তার মার্গ খাশ ক্লাসিক। অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশধর্মে যুক্তি এবং মুক্তি, রূপ এবং প্রকাশ, ক্লাসিক ও রোমান্টিক এক গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছে। বিবোধের পরিণতি ঘটেছে মিলনে। বিভেদ আশ্রয় পেয়েছে ব্যঞ্জিত সমন্বয়ে।

চার

কিন্তু মিলন ঘটে বলে এদের বিরোধ কাল্পনিক নয়। বরং বাস্তব ইতিহাসে মিলনের তুলনায় বিরোধের প্রাবল্যই বেশী চোখে পড়ে। কারণ সমঞ্জসার প্রয়োজন আমাদের জীবনে যত বেশী, সমঞ্জসায় পৌঁছন আমাদের পক্ষে ততই কঠিন। ব্যক্তির জীবনে এবং সমাজের ইতিহাসে কখনো-বা রোমান্টিক উদ্বেগ কখনো-বা ক্লাসিক সংযম প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য কোন সময়েই একটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে অন্যটি টিকতে পারে না। কিছু রোমান্টিক আতিশয্যের প্রতিক্রিয়ায় উগ্র ক্লাসিক এবং উগ্র ক্লাসিকের প্রতিক্রিয়ায় উগ্রতর রোমান্টিক—সভ্যতার ইতিহাসে এ ত হামেশাই দেখা যায়। সফিষ্টদের প্রাতিস্বিক বহুবাচনিক-তার বিরুদ্ধে প্লেটোর রূপনির্যাসতত্ত্ব, স্কোলাস্টিক ব্রহ্মব্যাখ্যানের বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের ব্যক্তিবিকাশ সাধনা, এলিজাবেথিয় রোমান্টিকতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানাশ্রয়ী যুক্তিবাদ এবং সে যুক্তিবাদী একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে সমানভাবে একদেশদর্শী রোমান্টিক বিদ্রোহ —পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁর কিছু পরিচয় আছে তিনি এজাতীয় বহু ঘটনার উল্লেখ করতে পারবেন।

অবশ্য এ ঘটনাপ্রবাহের পশ্চাতে আরেকটি সত্য নিহিত আছে। এটি অনেক সময়েই পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকদের চোখ এড়িয়ে যায়। সত্যটি হ'ল এই যে এ-সমস্ত বিরোধ এবং প্রতিক্রিয়ার অন্তরালে একটি সুগভীর ধারাবাহিকতা বর্তমান। তার কারণ উগ্র ক্লাসিকের মধ্যেও রোমান্টিক ধারা কখনো সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয় নি এবং চরম রোমান্টিককেও নিজের অজ্ঞাতে ক্লাসিক ঐতিহ্য আত্মস্থ করতে হয়েছে। প্লেটোর দর্শনে, বৈজান্তিয় এবং রোমক গীতিকবিতায়, উচ্চেল্লো কি পিএরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্কার ছবিতে, রাকিনের নাটকে সুস্পষ্ট সচেতন ক্লাসিক সাধনার অন্তরালে রোমান্টিকতার প্রচ্ছন্ন গভীর ধারা অস্বীকৃত হয়েও অনস্বীকার্য ভাবে বিদ্যমান। অন্যধারে কি সফিষ্টদের চিন্তায়, কি রেনেসাঁসী সাধনায়, কি রোমান্টিক আন্দোলনে ক্লাসিক-তন্ত্রের ঐতিহ্য সিংহাসনচ্যুত হয়েও সংগোপনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রমাণ প্রোটাগোরাসের দর্শন, আলবর্তির জীবনচরিত, শেক্‌সপীয়রের পরিণতকালের নাটক, ব্লেকের ছবি, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ, বায়রণ, শেলীর কবিতা।

অবশ্য এ ধারাবাহিকতা সব সময়ে পুরোপুরি বজায় থাকে নি। ধারাবাহিকতায় ছেদ আনার জন্য উভয় মেজাজের চরমপন্থীরাই বারবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ চেষ্টার পরিসমাপ্তি সহজেই অনুমেয়। রোমা-ন্টিককে সম্পূর্ণ বর্জন করে যে ক্লাসিক তা নিতান্ত নিষ্প্রাণ; ক্লাসিককে বরবাদ করে যে রোমান্টিকতা রূপহীন, নিরর্থ। ইয়োরোপে মধ্যযুগে এজাতীয় বিশুদ্ধ ক্লাসিকতন্ত্রের চর্চা কিছুকাল ব্যাপকভাবে চলেছিল। তার ফলে শিল্পসাহিত্যে, সমাজজীবনে, দর্শনচিন্তায় দেখা দিয়েছিল জাড্য এবং পুনরাবৃত্তির বন্ধ্যা যুগ। বর্তমান কালে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সুরিয়লিস্ত্‌রা কিছুকাল মরীয়া হয়ে বিশুদ্ধ রোমান্টিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় কোমর বেঁধেছিলেন। ব্যক্তির পূর্ণমুক্তির নামে তাঁরা যে সব অসংলগ্ন অদ্ভুত-কিম্ভুতের প্রদর্শনী খুলেছিলেন, তাতে অবশ্যই অভিনবত্ব ছিল,

কিন্তু সার্থকতা বা বিকাশব্যঞ্জনার কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও ছিল না। অভ্যস্ত রীতিনীতি রূপপ্রকরণের বেড়াভাঙায় এ আন্দোলন কিছু সাহায্য করেছে। কিন্তু একদা-সুরিয়লিস্ত্‌দের মধ্যে যে কজন শিল্পী সৃষ্টিক্ষমতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের একজনও এই উগ্ররোমান্টিকতায় স্বকীয় সৃজনধর্মের কোনো আশ্রয় খুঁজে পান নি। আপন আপন বিকাশের প্রয়োজনে নানাপথে তাঁদের সঙ্গতির সন্ধান করতে হয়েছে।

পাঁচ

সুতরাং ক্লাসিক এবং রোমাণ্টিক পরস্পর হতে বিভিন্ন, এমন কি পরস্পর বিপরীত হয়েও একে অন্যের সহযোগ ছাড়া সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। রূপের সীমাছাড়া প্রকাশ অসম্ভব, আর প্রকাশের আকুতিহীন রূপ নিষ্প্রাণ। তবে দুই-এ মিলে এক হয় বলেই দুটি এক নয়। কারো জীবনশিল্পে-বা রূপ মুখ্য, প্রকাশ গৌণ; কারো-বা প্রকাশের আকুতিই মূল প্রেরণা, রূপের আশ্রয় বিধেয় মাত্র। দু-এর তুল্যমূল্য সঙ্গতি মানবতন্ত্রের সাধনা। সারা বিশ্বজগৎকে ব্যক্তির সত্তায় অনুভব করে সেই মহৎ ঐক্যে প্রাতিস্বিকের সার্থক প্রকাশ ঘটলে তবেই এ সাধনার পূর্ণতা। যেহেতু এ পূর্ণতা চিরদিন আমাদের অনায়ত্ত, সে কারণে এ সাধনাও চিরকাল ক্ষান্তিহীন। স্থানকালপাত্রের বিভেদে এ দ্বৈত বারবার নবনব সঙ্গতি লাভ করবে—তার কোনোটি-বা অন্যটির তুলনায় সমৃদ্ধতর—কিন্তু কোন সঙ্গতিই চরম নয়। জগৎ একধারে যেমন বিরাট অন্যধারে তেমনি নিয়তপরিবর্তনশীল। মানুষের জিজ্ঞাসা নিঃসীম এবং তার বিকাশ অনন্ত। সুতরাং যতদিন না মানুষজাতি অথবা মনুষ্যধর্ম এ জগৎ হতে লোপ পাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ক্লাসিক এবং রোমাণ্টিকের মধ্যে সাযুজ্য-সাধনা অসমাপ্য প্রয়াসরূপে নিয়ত বিদ্যমান থাকবে।

মানব সংস্কৃতির প্রথম অধ্যায় হতে এ সাধনার শুরু। ভিন্নভিন্ন

দেশকালে যখনি কোনো ব্যক্তি এই সংগতির কোনো একটি সম্ভাব্য মার্গের সন্ধান এনেছেন, তখনি মানব সমাজ মনুষ্যত্ব-বিকাশের ইতিহাসে এক ধাপ এগিয়ে গেছে। ব্যক্তির একক অথবা ব্যক্তিদের মিলিত প্রয়াসে অর্জিত সে সঙ্গতি কালক্রমেস মাজ-ঐতিহ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে সামাজিক রীতিনীতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, সংস্কার-ব্যবহারে ব্যাপক এবং বহুমুখী রূপ পরিগ্রহ করে। এমনিতর এক একটি মহৎ সঙ্গতির স্বাক্ষর চোখে পড়ে এপিকুরস-লুক্রেটিয়ুসের দর্শনে, লেওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবনশিল্পে, দিদেরোর সম্পাদিত "বিশ্বকোষে" গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সাধনায় এর কোনটিই পরিপূর্ণ নয়, প্রত্যেকটিই মহত্তর সঙ্গতির নির্দেশবাহী। নানা দেশে নানা কালে নানা মানুষের অর্জিত এই সব সার্থক সমন্বয় ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বমানবীয় উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকারেই আমাদের অক্ষয় ঐতিহ্যের যথার্থ সন্ধান মিলবে, আর মিলবে ব্যক্তির সর্বকালীন সাধনার অমোঘ ইঙ্গিত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনবিমুখতা

ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক প্রায় দেড়শ' সোয়াশ' বছর ইংরেজের সাগরেদী করেও বাংলা সাহিত্যের যে আজো বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটল না, তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ইংরেজ আমাদের লিখিয়ে ভাবিয়েদের অনেক তত্ত্বে তালিম দিয়েও একটা মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, বলতে কি অন্ধ করে রেখে গেছে। সত্য যে লজ্জার ঘাটে পা ধোয় না, একথা আমাদের ইংরেজ গুরুরা আমাদের শেখান নি। হয়ত একথা শেখাবার তাকত তাঁদের ছিল না। কেননা ইংরেজের কাছে যখন আমরা তালিম নিতে শুরু করলাম তখন আর ইংরেজ এলিজাবেথান-জেকোবিয়ান যুগের ইংরেজ নেই, তার মতি-পরিবর্তন ঘটেছে। রেনেসাঁসের সত্যান্বেষণ ক্ষীণ হতে হতে রূপান্তরিত হয়েছে রোমাণ্টিক সত্যবিমুখতায়; তার বীর্যান্বিত ভোগবুদ্ধি শীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয় বিবেকের মেদাতি-শয্যের নীচে চাপা পড়েছে। ফলতঃ ডানের কবিতা, হব্‌স্‌-এর দর্শন, সুইফ্‌টের ব্যঙ্গ কিংবা স্টর্নের উপন্যাস বাঙালী শিক্ষিতমনের উজ্জীবনে বিশেষ কোন ছাপ ফেলে নি। এমন কি যদিও শেক্সপীয়রের নাম বলতে আমরা গদ গদ বোধ করেছি তবু কি উনিশ কি বিশ শতকে এমন বাঙালী লেখকের সন্ধান পাওয়া শক্ত যাঁর লেখায় শেক্সপীয়রী মেজাজের কিছুটা আভাস চোখে পড়ে। রোমাণ্টিক ভাবালুতার আওতায় আমরা জীবনের চাইতে কল্পনাকে বড় বলে ভাবতে শিখেছি; ভিক্টোরিয় ঔচিত্যবোধে দীক্ষা নিয়ে আমাদের ধারণা হয়েছে সত্যের চাইতে শ্লীলতা বেশী মূল্যবান। আমাদের সাহিত্য-কল্পনা পুষ্ট হয়েছে স্কট-ওয়র্ড্‌সোয়র্থ-টেনিসন-ডিকেন্সের ঐতিহ্যে। ফলে আমাদের লেখকেরা মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের অনুধাবন না করে তার ভাবরূপটিকে নিয়ে মশগুল হয়েছিলেন। শুধু হয়েছিলেন না, বাংলার অধিকাংশ লেখক আজও সে মোহ কাটাতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ থেকে

বুদ্ধদেব বসু, এঁরা সকলেই কমবেশী এই রোমান্টিক-ভিক্টোরীয় ধারার সাধক। প্রসাদগুণের খাতিরে এঁরা জীবনের অনেকগুলো দিককেই সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। বাংলাভাষায় আজো যে কোনো প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস কি নাটক লেখা হল না, আমার বিশ্বাস বিচার করলে দেখা যাবে রোমান্টিক-ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যের অনুসরণ তার জন্য অনেকখানি দায়ী।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা হয়ত স্পষ্ট হবে। দেহকে বাদ দিয়ে মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং মানুষ সম্বন্ধে সত্যকথা লিখতে হলে দেহের দিকে চোখ ঠারলে চলবে কেন? অথচ ইংরেজী সাহিত্যে পাঠ নিয়ে আমরা কি লেখক কি পাঠক সকলেই শরীরটাকে নিয়ে অদ্ভুত কুণ্ঠা বোধ করতে শিখেছি। ইংরেজি সাহিত্যে চিরকাল এ কুণ্ঠা ছিল না; ক্যান্টরবেরী টেলসের কবি থেকে ট্রিস্ট্র্যাম শ্যাণ্ডীর ঔপন্যাসিক পর্যন্ত অনেক ইংরাজ লেখকই দেহ এবং মন সম্বন্ধে সমান কৌতূহলী ছিলেন। কিন্তু উনিশশতকের গোড়ার দিকে নানা কারণে শিক্ষিত ইংরেজের রুচিতে এক মস্ত পরিবর্তন শুরু হয় এবং ক্রমে ইংরেজি সাহিত্যে দেহ এবং বিশেষ করে দেহের আদিম প্রক্রিয়া প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কুণ্ঠা প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের শিক্ষিত জনের রুচি যে-ইংরেজের প্রভাবে গড়ে ওঠে, সে এই দেহ-কুণ্ঠিত ইংরেজ। ফলে গত একশ' বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিদ্যাসাগর[১]

(১) বাঙলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথার্থ স্থান নিরূপণের এখনও পর্য্যাপ্ত চেষ্টা হয়নি। তাঁর সম্বন্ধে অধিকাংশ আলোচনায় ভক্তির ভার যতবেশী, বিশ্লেষণের চেষ্টা তত কম। ফলে তাঁকে "অশ্লীল লেখক" বলে অভিহিত করলে অনেক পাঠকই চটে উঠে প্রতিবাদ করবেন। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর বিদ্যা আধুনিক কালের শিক্ষিতদের মত শুধু ইংরেজির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; তাঁর রুচি মুখ্যত সংস্কৃত সাহিত্য হতে পুষ্টি আহরণ করেছিল। এবং সংস্কৃত লেখকদের আর যে ত্রুটিই থাক দেহ সম্বন্ধে কোন শুচিবাই ছিল না।

এবং দীনবন্ধু মিত্রের লেখায় ছাড়া অন্য প্রায় কোথাও দেহ সম্বন্ধে কুণ্ঠাহীন উল্লেখ চোখে পড়ে না।

এই কুণ্ঠা বোধহয় প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। একধারে খ্রীষ্টান মিশনারীদের এবং অন্যধারে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব ক্রমে এই কুণ্ঠাকে আমাদের শিক্ষিতমনে দৃঢ়মূল করে

বিদ্যাসাগর মশায়ের সমাজ-সংস্কার ক্রিয়ার রচনাবলী যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই সত্যসন্ধ মানুষটি কোন রকম ভদ্রতার আব্রু রাখেননি। তাঁর "আবার অতি অল্প হইল" (কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য) লেখাটি হতে একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দাখিল করছি:

"খুড়া অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ বটে, কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই, সুতরাং অপচার এবং উদরাধ্মান হইয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে যে নিঃসরণ হইতেছে তাহার সৌরভে সমস্ত দেশ আমোদিত করিতেছে।"

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরেকটা খুব ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত আছে। তাঁর ভাষা নাকি একান্তভাবেই সংস্কৃতঘেঁষা এবং সে কারণে গতিহীনা। বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষার আমদানী করে সে ভাষার গতি যাঁরা বাড়াবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে টেকচাঁদ, হুতোম, বীরবলের নাম সকলেই জানেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইও যে তাঁর লেখায় প্রচুর আরবী ফারসী এবং দেশজ কথা ব্যবহার করেছেন এটা অতি অল্প লোকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। আসলে বিদ্যাসাগরের খোশমেজাজী লেখার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় অল্প। "অতি অল্প হইল" এবং "আবার অতি অল্প হইল" হতে দুচারটে নমুনা দিলে পাঠকেরা হয়ত আন্দাজ করতে পারবেন ভাষার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর কত মুক্তবুদ্ধি ছিলেন। "বেহুদা পণ্ডিত", 'দেদার ভুল', 'ছরকট করিয়াছেন', 'সংস্কৃত বিদ্যায় ফাজিল'। 'গোমুখ্য বুদ্ধি'। 'বেয়াড়া খ্যাতি', 'রঙ্‌দার, বিদকুটে,' 'তুয়াক্কা' 'দিলদরিয়া', 'তুখড় ইয়ার'—এসব বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত শব্দ। তিনি নিজেই লিখেছেন "লোকে জানে আমার চালাকি ও ফচকিয়ামি আসে না।" আমার ধারনা পশ্চিমী রেনেসাঁসের এরাজমুসের সঙ্গে বিদ্যাসাগর চরিত্রের গভীর মিল আছে।

এবং পরে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপ্রধান কল্পনায় এ কুণ্ঠা মনুষ্যত্বের অন্যতম প্রধান লক্ষণরূপে প্রতিভাত হয়। নায়ক নায়িকারাও যে হাঁচেকাশে, খায়দায়, মলমূত্র ত্যাগ করে, সম্ভোগকামনার দ্বারা পীড়িত হয় এবং জ্ঞানান্বেষণ কি নীতিবোধের মত এগুলিও যে মনুষ্যত্বের সামান্য লক্ষণ— রোমান্টিক-ভিক্টোরীয় ইংরেজ-রুচির আওতায় পড়ে মানুষ সম্বন্ধে এই নিতান্ত সাধারণ সত্যকথা আমাদের সাহিত্যিকেরা ভুলেছেন এবং পাঠকদের ভোলাবার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে আমাদের সাহিত্যে মানুষের যে রূপটি প্রধান হয়ে উঠেছে, সেটিতে দরজির হাত যত স্পষ্ট, প্রকৃতির হাত ততটা নয়। ভাল দরজির কারিগরী নিশ্চয়ই তারিফ পাবার যোগ্য; তবু বণ্ড স্ট্রীটের দরজিরও সাধ্য নেই যে শুধু ছুঁচ সূতো আর কাঁচির জোরে একটা আস্ত জ্যান্ত মানুষ পয়দা করে। বাঙালী লেখক যতদিন এই সহজ কথাটি না হৃদয়ঙ্গম করছেন ততদিন তাঁর কলম আর যাই পারুক স্তাঁদালের মত উপন্যাস অথবা শেক্সপীয়র কি মোলিএরের মত নাটক রচনা করতে পারবে, এ আশা সুদূরপরাহত।

কুণ্ঠা যে সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক, আরেকদিক হতেও একথাটা বিচার করা যেতে পারে। সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা এবং একথা সকলেই জানেন যে ভাষার বিকাশ ছাড়া সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব। অথচ রোমান্টিক-ভিক্টোরীয় সাহিত্য ভাষা সম্বন্ধে যে আদর্শে আমাদের লেখকদের দীক্ষিত করেছে, সে আদর্শ মেনে নিলে ভাষার বিকাশ কিছুদূর পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। কেননা এই আদর্শ অনুসারে শুধু শ্লীলতার শীলমোহর দেওয়া ভাষাই সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। অথচ এই শীলমোহর দেবার যাঁরা অধিকারী তাঁরা সমাজের একটা ছোট অংশমাত্র। ফলে অধিকাংশ লোক যে ভাষায় ভাবে এবং কথা বলে তার অনেকখানিই সাহিত্যে অপাংক্তেয়। এ অবস্থায় ভাষার বিকাশ যে শুধু ওপরতলার লোকেদের লেনদেনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে এ আর আশ্চর্য কি? ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে এ আদর্শ চালু

হবার আগে শেক্সপীয়র, বেন জনসনের মত লেখক সে ভাষায় লিখে গেছেন। বাংলা গদ্যসাহিত্য সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রভাবে টেকচাঁদ, দীনবন্ধু [২] এবং হুতোমের মত

---

(২) বাংলা গদ্যের আলোচনায় টেকচাঁদ এবং হুতোমের তবু নাম করা হয়, কিন্তু দীনবন্ধু এখনো পর্যন্ত অবজ্ঞাত রয়ে গেছেন। অথচ কি ভাষা, কি উপজীব্য উভয় দিক থেকে বাংলা গদ্য সাহিত্যে দীনবন্ধুর দুঃসাহসিকতার তুলনা মেলা কঠিন। দীনবন্ধু প্রথম শ্রেণীর লেখক নন, যেখানে তিনি সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন সেখানে তিনি প্রায় অপাঠ্য; তাঁর কল্পনা খুব সীমাবদ্ধ। তবু যেখানে তাঁর বিশিষ্টতা সেখানে তিনি আজো বাঙালী লেখকদের মধ্যে অদ্বিতীয়। শিক্ষিত সমাজ যাদের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছে, গ্রামের সেই অশিক্ষিত মানুষদের তিনি যত সহজে সাহিত্যে স্বাগত করতে পেরেছেন, তাঁর পরে এই সত্তর-আশি বছরের মধ্যে আর কোনো লেখক তা পারলেন না,—না রবীন্দ্রনাথ, না তারাশঙ্কর, না বিভূতিভূষণ, না মাণিক বাঁড়ুয্যে। এবং যখনি তিনি সাধুভাষা ছেড়ে কথ্যভাষায় লিখেছেন তখনি তাঁর গদ্যে এমন এক বলিষ্ঠ গতিশীল, স্বতঃস্ফূর্ত সত্যবোধের স্বাদ এসেছে যার পাশে টেকচাঁদ ও হুতোমকে ম্লান এবং বীরবল ও অন্নদাশঙ্করকে কৃত্রিম ঠেকে। 'নীল দর্পণে'র তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ভাষা এরই প্রামাণিক উদাহরণ।

ক্ষেত্র—ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসীর সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও; আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না। (হস্ত ধরিয়া টানিল) ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা; হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা।

রোগ—তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে; আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না। বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র—মোর ছেলে মরে যাবে—দই সাহেব—মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতী।

রোগ—তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না। (বস্ত্র ধরিয়া টানিল)।

স্বল্পসমর্থ লেখকেরা বাংলা গদ্যের ইতিহাস হতে একরকম প্রায় মুছে গেছেন। পরবর্তী কালে বীরবলের চেষ্টায় বাংলা গদ্যে সাধুভাষা এবং চলতিভাষার মাঝখানের ব্যবধান কিছুটা কম্‌ল বটে, কিন্তু তিনিও শ্লীলতার মোহ কাটাতে পারেন নি। বাংলা ভাষা নিয়ে যিনিই কারবার করেছেন তিনিই জানেন বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভাষা কত দুর্বল, কত দরিদ্র। এর অবশ্য বহু কারণ আছে ; কিন্তু ভাষার শ্লীলতারক্ষা বিষয়ে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মোহ যে তার একটা প্রধান কারণ, ক'জন লেখক এতাবৎ সে কথা নিজের কাছে স্বীকার করতে পেরেছেন। দেহাতীভাষা, বস্তির ভাষা, চায়ের দোকানে খেলার মাঠে হামেশাই যে ভাষা শোনা যায় সেই খিস্তির ভাষা বাংলা গদ্যসাহিত্যে আজও তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। অথচ অন্য কারো লেখার সঙ্গে যদি পরিচয় নাও থাকে এক শেক্সপীয়রের ভাষা থেকেই এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে কাব্যের এবং দর্শনের ভাষার সঙ্গে খিস্তির ভাষার ব্যবধান বড়জোর একচুল, এবং খিস্তির ভাষার মধ্যে কাব্য বা দর্শনের ভাষার চাইতে কম ব্যঞ্জনা লুকিয়ে নেই।[৩]

ক্ষেত্র—ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটা করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও।

স্বভাবতই এ ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হয়নি। দীনবন্ধুর জীবনী এবং কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে তিনি দীনবন্ধুর রুচির দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে একথাও স্বীকার করেছেন যে এ দোষ ইচ্ছাকৃত নয়, তিনি তাঁর তীব্র সহানুভূতির অধীন ছিলেন বলেই এ দোষ ঘটেছে। বঙ্কিম 'সধবার একাদশীর' পাণ্ডুলিপি পড়ে দীনবন্ধুকে জানিয়েছিলেন যে, ঐ প্রহসন "বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে" এবং সে কারণে অনুরোধ করেছিলেন যে, "ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়।" বাংলা সাহিত্যের জোর বরাত দীনবন্ধু শেষ পর্যন্ত বন্ধুর সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি।

---

(৩) এ কথায় যদি কারো আপত্তি থাকে তবে তাঁকে হ্যামলেট, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য স্মরণ করতে বলি :

টেরেন্স বলেছিলেন, আমি মানুষ, সুতরাং মানুষের কোনকিছুই আমার অনাত্মীয় হতে পারে না। এ শুধু মানবতন্ত্রীর কথা নয়, এ খাশ সাহিত্যিকের কথা। আর মানুষ সম্বন্ধে সত্যকথা যে লিখতে চায়, ভাষার শুচিবাই তাকে ছাড়তেই হবে। ইংরেজের মারফৎ রেনেসাঁসী জীবনদর্শনের সঙ্গে আংশিক পরিচয় ঘটার ফলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাঙালী গল্পলেখকদের মধ্যে অনেকে অধ্যাত্মতত্ত্বের চর্বিত চর্বণ ছেড়ে মানুষের জাগতিক জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হতে শিখেছেন। কিন্তু এই একশ' বছরেও এ কৌতূহল যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয় নি তার একটা প্রধান কারণ সে জীবনদর্শন ভিক্টোরীয়

Queen : Come hither, my good Hamlet, sit by me.
Hamlet : No, good mother, here's metal more attractive.
Polonius : O, ho, do you mark that ?
Hamlet : Lady, shall I lie in your lap ?
Ophelia : No, my lord.
Hamlet : I mean, my head upon your lap ?
Ophelia : Ay, my lord.
Hamlet : Do you think I meant country matters ?
Ophelia : I think nothing, my lord.
Hamlet : That's a fair thought to lie between maid's legs.

দার্শনিক যুবরাজের মুখে এ জাতীয় ভাষা দিতে শেক্সপীয়রের এতটুকু সঙ্কোচ হয়নি। ঐ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে "To be or not to be" বিখ্যাত স্বগতোক্তির ঠিক পরেই হ্যামলেট-ওফেলিয়ার কথোপকথন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ফলস্টাফ্, ইয়াগো, উন্মাদ লীয়র—এদের ভাষা কিম্বা ভাবনায় কি কোন শ্লীলতার আব্রু আছে ? শুধু কি তাই। হ্যামলেট নাটকের করুণতম মুহূর্তে নিষ্পাপ কিশোরী ওফেলিয়াকে দিয়ে শেক্সপীয়র কি গান গাইয়েছেন (চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।):

Quoth she, before you tumbled me,
You promis'd me to wed.
So would I ha' done, by yonder sun,
An thou hadst not come to my bed.

শুচিবাইয়ের প্রভাবে অনেকটা বিকৃত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। ফাঁপা অভিজ্ঞতার ওপরে কথার চেকনাই দিয়ে মহৎ সাহিত্য কোনদিন রচিত হয় নি। বিশ্বাসের চাইতে যুক্তি বড়, অভ্যস্ত পথে চলার চাইতে নিজের বিবেকবুদ্ধি খাটানোর দাম বেশী, মানুষ-মানুষীর সুখদুঃখ নিয়ে না লিখতে শিখলে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ইংরেজের কাছ থেকে এ তত্ত্ব শেখার ফলে বাংলা সাহিত্য-মানসের একদিন নতুন করে উজ্জীবন ঘটেছিল। কিন্তু তারপর আর আমরা খুব বেশী এগোতে পারি নি। আমরা এখনো এটা বুঝি নি যে, মানুষের কথা যিনি লিখতে চান তাঁর কাছে কি ভাষা কি বিষয়বস্তু সবক্ষেত্রেই শ্লীলতার চাইতে সত্যের দাবী অনেক বেশী বড়। কুলের টান যত বড়ই হোক না কেন শ্যামের টানেব কাছে তা তুচ্ছ।' বাংলা ভাষায় যথার্থ মহৎ সাহিত্য তখনি সম্ভব হবে যখন রাধার মত বাঙালী লেখকেরাও ঠেকে বুঝবেন : লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।

ওথেলো, চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে ডেসডেমোনার "Sing willow, willow, willow" গানের অসমাপ্ত শেষ চরণটি নাট্যকার অকারণে ও গানে বসান নি:, "If I court moe women, you'll couch with moe men". আধুনিকতম কোনো বাঙালী কবি কি তরুণী নায়িকার মুখে "tumble" বা "couch with" জাতীয় ভাষা দিতে পারেন? তবু ত এ তরুণীর ভাষা। যেখানে সে বাধা নেই মহাকবি সেখানে আর কোনো রেয়াৎ করেননি :

Even now, now, very now, an old black ram
Is tupping your white ewe.

(ওথেলো, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।)

এর বাংলা যদি কেউ করতে পারতেন, তবে সে এক দীনবন্ধু মিত্র।

দুই

এবং আমার বিশ্বাস এই বোঝার ব্যাপারে বাঙালী লেখক ফরাসী লেখকের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারেন। কেননা রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী সত্যসন্ধিৎসা ফরাসী সাহিত্যে যেমন পরিণত এবং প্রায় অব্যাহত প্রকাশ লাভ করেছে, তেমনটি বোধহয় আর কোন সাহিত্যে লাভ করে নি। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের ঐতিহ্য এই সত্যসন্ধিৎসার দ্বারা সমৃদ্ধ। সে সন্ধান মানুষের দেহমনের কোনো দিককেই লজ্জার অন্ধকারে আত্মগোপন করতে দেয় নি। ছি ছি'র ভয়ে অন্বেষণের মুখে লাগাম টানা ফরাসী লেখকের ধাত নয়। রাবেলে-মলিএরের রচনায় যে মানব-পরিক্রমা শুরু হয়েছিল ফ্রাঁস্-প্রুস্ত্, কেমু-সার্ত্র্-এ পৌঁছে আজও তাতে ক্লান্তি এল না।

ফরাসী গদ্য সাহিত্যের পথিকার রাবেলের কথাই ধরা যাক। ১৪৯৪ সালে এঁর জন্ম—অর্থাৎ শেক্সপীয়রের সত্তর বছর আগে। মধ্যযুগের দীর্ঘ রাত সবে ফিকে হতে শুরু করেছে। কিন্তু ফরাসী চিন্তা তখনো জীবন-বিমুখ ধর্মতত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন। পুরুত মোহান্তরাই তখন সমাজের সবচাইতে ক্ষমতাশালী পুরুষ। রাবেলেও প্রথম যৌবনে ধর্মতত্ত্বের চর্চা করেছিলেন—কিন্তু তাঁর কুতূহলী মন মঠের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে মেনে নিতে পারল না। মঠে থাকা কালেই রেনেসাঁসের নতুন যে মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছিল তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সযত্নে এবং সঙ্গোপনে তিনি গ্রীকভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করলেন; তাঁর চোখ থেকে খ্রীষ্টান আত্মনিগ্রহশীল নীতিতত্ত্বের আবরণ খসে পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন জীবনের অর্থ সম্ভোগের মধ্যে, নিগ্রহের মধ্যে নয়; সুস্থ মানুষের পক্ষে কল্পিত পাপের জন্যে কান্না হা-হুতাশ করার চাইতে কৌতুক করাটাই বেশী স্বাভাবিক; তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে "ভাগ্যের অনিশ্চয়তার মুখে তুড়ি মেরে যে জন মনের ফূর্তি বজায়

রাখতে পারে সেই যথার্থ দার্শনিক।" সেদিন একথা বলতে গেলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা ছিল। রাবেলেকেও তাই রফা করে বাঁচতে হয়েছে, কিছুটা রেখে ঢেকে বলতে হয়েছে।[৪] কিন্তু মুক্তবুদ্ধির জিজ্ঞাসাকে কে রুখ্‌তে পারে। রাবেলের জিজ্ঞাসা তাঁকে মঠছাড়া করল, ঘোরালো পথে পথে, শহরে গ্রামে, কখনো পণ্ডিতদের জগতে, কখনো শুঁড়িখানায়। তিনি দর্শন পড়লেন, আইনকানুন পড়লেন, শেষ পর্যন্ত উত্তরতিরিশে পৌঁছে চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চা শুরু করলেন। ধর্মতত্ত্বের চাইতে শরীর-তত্ত্বের মধ্যে মানুষের প্রকৃত খোঁজখবর মেলার সম্ভাবনা অনেক বেশী, সেই ধর্মান্ধতার যুগেও একথা বুঝতে তাঁর খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি। আটত্রিশ বছর বয়সে রাবেলেকে তাই আমরা দেখি লিয়ঁ শহরের হাসপাতালে প্রধান চিকিৎসকরূপে। একধারে তিনি মধ্যযুগীয় টীকাভাষ্যের জঞ্জাল সরিয়ে হিপোক্রেটেস এবং গালেনের আয়ুর্বেদ বিষয়ক মূল রচনাবলীর সম্পাদনা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথার্থ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন; অন্যধারে রোগনির্ণয় এবং নিরাময়ের উদ্দেশ্যে নানা দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তিনি আধুনিক আয়ুর্বেদের গোড়া-পত্তন করেছেন। শোনা যায় তিনি চিকিৎসক থাকা কালে লিয়ঁ শহরে মৃত্যুহার লক্ষ্যতঃভাবে কমে যায়।

জীবন সম্বন্ধে এই অসীম কৌতূহল, জীবন সম্ভোগের এই অক্লান্ত

---

(৪) রফা করেই কি সব সময়ে রেহাই মিলেছে। যৌবনে মঠে থাকা কালে কর্তৃপক্ষ টের পান যে তিনি গোপনে গ্রীকভাষা চর্চা করছেন, ফলে তাঁর নিজস্ব গ্রীক গ্রন্থসংগ্রহ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তীকালে গার্গাতুয়া-পাঁতাগ্রুয়েল কাহিনীর এক এক খণ্ড যেমন যেমন বেরিয়েছে আর অমনি সর্বোনের অসীম ক্ষমতাশালী কর্তরা তার প্রকাশ এবং প্রচার নিষিদ্ধ করেছেন। তবু যে তাঁকে খুব বেশী ভুগতে হয়নি তার কারণ পারীর বিশপ ছিলেন তাঁর একজন মস্ত সমঝদার পৃষ্ঠপোষক। এঁরি খাতিরে পোপ রাবেলেকে ক্ষমা করেন এবং রাজা নিজে তাঁকে তাঁর বই ছাপানোর জন্যে বিশেষ অনুমতি দান করেন।

ক্ষমতা, জীবন বিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অর্জিত এই বিচিত্র জ্ঞানসম্ভার নিয়ে রাবেলে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে নামলেন তখন দেখা গেল কি উপাদান সম্পদে, কি বাচননৈপুণ্যে রেনেসাঁসের সেই অসামান্য সমৃদ্ধ যুগেও তাঁর জুড়ি মেলা দুষ্কর। গার্গাঁতুয়া-পাঁতাগ্রুয়েল মহা-কাহিনীর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৫৩২ সালে, চতুর্থ পর্ব ১৫৫২ সালে। সম্ভবত তার পরের বছরে রাবেলের মৃত্যু ঘটে। (তাঁব মারা যাবার দশ-বারো বছর পরে এ কাহিনীর পঞ্চম পর্ব নামে যে বই বেরোয় পণ্ডিতদের মতে তার বেশীটা অনুকারকদের রচনা, রাবেলেব নয়।) প্রায় বিশ বছর ধরে ফাঁদা এই বিরাট গালগল্পের মধ্যে আব যাই থাক লজ্জাসঙ্কোচ কি দৈন্যকার্পণ্যের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর কল্পনায় দুর্লভ প্রাণশক্তির সঙ্গে দুর্লভতর বৈদগ্ধ্যের মিলন ঘটেছে, ব্যাপক জ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি ঘটেছে ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার, সুতীক্ষ্ণ দার্শনিকতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে তীক্ষ্ণতর কৌতুকবোধ। যেমন ভাব তেমনি ভাষার ব্যাপারে কোন উচিত অনুচিতের নিষেধ তিনি মানেন নি, তাঁর বিপুল অট্টহাস্যের ধাক্কায় সেসব নিষেধের গণ্ডী বুদ্বুদের মত নিমেষে ফেটে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তত্ত্বকথাকে খিস্তির ময়ান দিয়ে সুস্বাদু এবং সুপাচ্য করতে যেমন তিনি এতটুকু ইতস্তত করেন নি, তেমনি শারীরিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে দর্শনপ্রস্থানের অবতারণা করা তাঁব কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল। মোটকথা রেনেসাঁসের এই মানবতন্ত্রী সত্যসন্ধিৎসাকে ঔচিত্যবোধের চাইতে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন এবং তা দিয়েছিলেন বলে বোকাচ্চিও, শেক্সপীয়র এবং সর্ভান্তেসের মত রাবেলেও দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে নিত্যতা এবং বিশ্বজনীনতা অর্জন করেছেন।

ফরাসী সাহিত্যমানসে রাবেলে যে মানবতন্ত্রী জীবনবোধের বীজ বপন করেন গত চারশ' বছরে তা বিচিত্র শস্য-সম্ভারে বিকাশ লাভ করেছে। তার মানে এ নয় যে রেনেসাঁস-উত্তর সব ফরাসী লেখকই রাবেলের

প্রদর্শিত পথের যাত্রী অথবা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে অন্য কোন ধারা অবর্তমান। রাসিন, শাতোব্রিয়ঁ কি রোলাঁকে রাবেলের উত্তর-সাধক বললে অবশ্যই ভুল করা হবে। মন্‌তেনের স্মিতকৌতুকের সঙ্গে রাবেলের অট্টহাস্যের যদি কোন সম্পর্ক থাকে তবে সেটি বৈপরীত্যের বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা বোধহয় একথা স্বীকার করবেন যে, ফরাসী সাহিত্যের, বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের, যেটি মূল ধারা পাঁতাগ্রুয়েলী জীবনবোধ তার প্রধান উৎস। এ জীবনবোধে ভাবরূপের চাইতে অস্তিত্ব বেশী মূল্যবান, সিদ্ধান্তের চাইতে জিজ্ঞাসা বেশী প্রবল, বিচার করার চাইতে বোঝবার আগ্রহ বেশী সক্রিয়। এ জীবনবোধ সম্ভোগে সরস, কৌতুকে উজ্জ্বল, যুক্তিশীলতায় শাণিত, মুক্তির অভীপ্সায় বেগবান। মলিএরের কমেডিতে, লা-ফঁতেনের নীতিগল্পে (আসলে যেগুলো খোশ-গল্প, নীতিতত্ত্বের ছিটেফোঁটাও এদের মধ্যে বার করতে হলে অনুবীক্ষণ কষতে হয়), ভল্‌তেয়ারের ব্যঙ্গরচনা এবং দার্শনিক কাহিনীতে এবং তার চাইতেও বেশী দিদেরো-র বড়গল্পে, বল্‌জাক্, ক্লদ্ তিলিএ (Mon Oncle Benjamin-এর অখ্যাত কিন্তু অসামান্য লেখক), আনাতোল ফ্রাঁস এবং সার্ত্র্-এর উপন্যাসে এ জীবনবোধ বিচিত্ররূপে প্রস্ফুরিত হয়েছে। এঁদের প্রত্যেকেরই মেজাজ, উপজীব্য-বিষয়, রচনারীতি পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ; তবু জীবনবোধের নিগূঢ় ঐক্যে এঁরা পরস্পরের এবং রাবেলের অতি নিকট-আত্মীয়। কৌতুকান্বিত সংশয়, সম্ভোগপুষ্ট বৈদগ্ধ্য, নিঃশঙ্ক জীবনজিজ্ঞাসা এবং ততোধিক নিঃসঙ্কোচ প্রকাশসামর্থ্য এঁদের প্রত্যেকের পরিণত রচনাকে সৎসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

এসব দুর্লভ গুণ শুধু যে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাবেলের উত্তরসাধক তাঁদেরি রচনায় বর্তমান তা নয়। সাধারণভাবে ফরাসী সাহিত্যের প্রতি শাখা, প্রতি ধারায় যা কিছু সার্থক রচনা তার প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই এসব গুণের একটি না একটি অথবা একত্রে সব কটির উপস্থিতি কমবেশী

চোখে পড়ে। ইয়োরোপের অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তবু যতদূর জানি তাদের কোনোটি সম্বন্ধেই এজাতীয় প্রস্তাব সম্ভবত প্রমাণসহ নয়। ইংরেজী, জার্মান, নরওয়েজিয়ান কি রুশ সাহিত্যেও এসব গুণে গুণী লেখক অবশ্যই আছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রতিভূ কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। অপরপক্ষে পূর্বোক্ত গুণাবলী ফরাসী সাহিত্য-মানসের সামান্য লক্ষণ। তাই সুমিতিসাধক মনতেন অত্যন্ত গুরু বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়েও হাটেবাটে চলতি নিতান্ত অসাধু, অশ্লীল অথবা গ্রাম্য-ভাষাকে প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি; তাই পাস্কালের চিন্তায় গভীর ধর্মবিশ্বাস গভীরতর সংশয়কে প্রশ্রয় দিয়েছে; বিপ্লবী বিশ্বকোষ (Encyclopédie) আন্দোলনের অকুতোভয় দার্শনিক দিদেরোর সবচাইতে পরিণত রচনা "নিয়তিবাদী যাক্ এবং তার প্রভু"-র কাহিনীতে তাই অলজ্জ ইন্দ্রিয়সম্ভোগের কৌতুকদীপ্ত বিবরণ জীবন-দর্শনের আসর জুড়ে বসেছে,[৫] স্তাঁদাল তাঁর উপন্যাসে তাই গাণিতিক যুক্তিশীলতার সঙ্গে জৈববৃত্তির বেপরোয়া তাগিদকে মেলাতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে এক দিদেরো ছাড়া আর কারোকেই রাবেলেপন্থী বলা চলে না; তবু যে সত্যসন্ধ জীবনবোধের কথা পূর্বে বলেছি এঁদের সকলেরি রচনা সে বোধে সমৃদ্ধ। আর শুধু গদ্য নয়, ফরাসী কাব্য-ঐতিহ্যও

---

(৫) Jacques le fataliste et son maitre দিদেরোর জীবিতকালে-প্রকাশিত হয়নি। এবং একথা অবিশ্বাস্য ঠেকলেও যতদূর জানি বিশ্ব-সাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদের ইংরেজী পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আজো কোন প্রকাশক বার করেননি। অথচ এ বই গ্যয়টে এবং স্তাঁদালকে মুগ্ধ করেছিল; এর অন্তর্নিহিত বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীকে মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স্ সোচ্ছ্বাসে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন; এবং ফরাসী-বিপ্লবের জীবন দর্শন যে এই আপাতদৃষ্টিতে অতি অশ্লীল উপন্যাসটিতে কত পরিণত প্রকাশ লাভ করেছে তা বর্তমান শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতন্ত্রী দার্শনিক কাসিরের সাহেবের নজর এড়ায়নি। দ্রষ্টব্য: E. Cassirer, Philosophy of the Enlightenment.

তার বিশিষ্ট পরিণতির জন্য এই জীবনবোধের কাছে ঋণী। ব্যদলেয়র, ভের্লেন, র‍্যাঁবো এবং লাফর্গ ত বটেই, এমনকি মালার্মে এবং ভালেরীও অনেকখানি এই জীবনবোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত। শেষোক্ত দু'জন সম্বন্ধে কেউ যদি আপত্তি করেন (ইংরেজ সমালোচকদের বক্তব্যের ওপরে নির্ভর করলে সে আপত্তি স্বাভাবিক) তবে তাঁদের পুনরায় 'ফনের অপরাহ্ন" (L' Aprés-midi d'un Faune) এবং "সাপের স্কেচ" (E'bauche d'un Serpent) কবিতা দুটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

ফরাসী সাহিত্যের মেজাজ সম্বন্ধে এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটুকু হয়ত স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে ফরাসী লেখকদের আর যা দোষই থাক ভাষা কি ভাব সম্বন্ধে শুচিবাইয়ের ব্যামোতে তাঁরা ভোগেন নি। ইংরেজীশিক্ষিত পাঠক তাতে তাঁদের বেহায়া বলতে চান বলুন ; ফরাসী সাহিত্যে ছি-ছি সম্বল নীতিবাগীশ এবং পেটরোগা নাবালকের পথ্য মেলা সত্যই শক্ত। কিন্তু ব্যাস-কালিদাস, হোমর-শেক্সপীয়রেই কি এদের পথ্য মেলা এত সহজ ? মোটকথা ফরাসী লেখক জীবনের ওপর শ্লীলতার বোরখা চাপাতে নিতান্তই গররাজী ; মূঢ় লজ্জার আবরণ ঘুচিয়ে অস্তিত্বকে মুক্তি দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ। এই আনন্দ ঘোর দুঃখবাদী ফরাসী লেখকের রচনাতেও স্ফূর্তির স্বাদ এনেছে। গোমড়ামুখো হাওয়াকেই যাঁরা দার্শনিকতার লক্ষণ মনে করেন সুকুমার রায় বর্ণিত সেই রামগরুড়সন্তানদের কাছে এ স্ফূর্তি অন্তঃসারহীনতার লক্ষণ বলে প্রতিভাত হবে সন্দেহ নেই ; কিন্তু জীবনের কাছে পাঠ নিয়ে যাঁরা প্রকৃত বৈদগ্ধ্য অর্জন করেছেন তাঁদের কাছে একথা স্পষ্ট যে ফরাসী লেখকের কৌতুকলঘু কল্পনা আসলে তাঁর নির্ভীক জীবন জিজ্ঞাসার একটি লক্ষণমাত্র। গত চারশ' বছরে ফরাসী সাহিত্যের, বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের, যে অতুলনীয় বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই নির্ভীক, কৌতুকসরস জীবনজিজ্ঞাসাই তার প্রধান এবং অক্ষয় উৎস।

তিন

বাংলাভাষাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান ব্যক্তিরা লেখা সত্ত্বেও বাংলাসাহিত্য আজো যে প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করতে পারে নি, আমার বিবেচনায় শিক্ষিত বাঙালীর মনে এই নিঃসঙ্কোচ জীবন-জিজ্ঞাসার অভাব তার অন্যতম প্রধান কারণ। বাঙালী লেখকের ভাষা এবং ভাবনা এখনো সত্যের টানে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় জয় করতে শেখে নি। আমাদের মধ্যে যাঁরা নামজাদা লেখক তাঁদের অধিকাংশই মিহিবুলিতে মোলায়েম ভাব পরিবেশন করে খুশী। ফলে বাংলা ভাষায় 'মিষ্টি লেখা'র খুব ছড়াছড়ি—এবং যেহেতু সব দেশের মত আমাদের দেশেও পাঠকপাঠিকাদের মন লেখকদের চাইতেও অপরিণত, সেকারণে আমাদের সাহিত্যে এই মিষ্টি লেখকদের রাজত্ব এখনও অপ্রতিহত।

অবশ্য এ ধারার বিরুদ্ধে কোন বাঙালী লেখকই যে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন নি তা নয়। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা এতাবৎ প্রকৃষ্টতর ঐতিহ্যে ফলপ্রসূ হয় নি। আমাদের দেশে পাঠক, সমালোচক, এবং লেখক প্রায় সকলেই ইংরেজীশিক্ষায় শিক্ষিত এবং সে শিক্ষা যে আমাদের অনেক কিছু দেওয়া সত্ত্বেও জীবনের কোনো কোনো প্রধান দিক সম্বন্ধে ভীত সঙ্কুচিত করে রেখেছে—একথা পূর্বেই বলেছি। আমাদের লেখকরা বিদ্রোহ করতে যেয়েও এই অর্জিত সঙ্কোচকে পুরোপুরি জয় করতে পারেন নি; ফলে তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত বিদ্রোহ-প্রয়াস কালক্রমে সঙ্কোচের কাছে হার মেনেছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' এই ব্যর্থতার একটি প্রধান উদাহরণ। তাঁর পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে তিনি ক্রমেই অস্তিত্বকে খাটো করে ভাবরূপকে প্রধান করে তুলেছেন। 'চতুরঙ্গে' বিদ্রোহের কিছু যদি-বা আভাস আছে, এবং 'ঘরে বাইরে' 'শেষের কবিতা'য় বিশুদ্ধ ভাবরূপের একেবারে জয়জয়কার। তাছাড়া বিদ্রোহীরা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন নি এ বিদ্রোহের নির্দেশ কোন পথে; এর উৎস কোন জীবন-দর্শনে। যে পাঁতাগ্রুয়েলী জীবনবোধ ফরাসী সাহিত্যকে পুষ্ট

করেছে, এঁরা প্রায় কেউই সে জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হন নি। 'শেষপ্রশ্নে' তাই কথার ফেনা বিস্তর, জীবনের স্বাদ আছে কি নেই। শরৎচন্দ্রের বেশ্যারা প্রত্যেকেই এক একটি সতীলক্ষ্মী, তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতম নায়কও শুধু যে সাধুভাষার কথা বলে তা নয়, সাধুভাষায় ভাবে, সাধু রীতিতে উচ্ছৃঙ্খল হয়। তবু যদিবা বিদ্রোহীদের মধ্যে দু'একজন যথার্থ সৎসাহসী দেখা গিয়েছিল তাঁদের অনেকেই আবার সাহিত্যকর্মে তেমন বিশেষ দড় ছিলেন না। মনের যে পরিণতির ফলে অস্তিত্বের জটিলতম অভিজ্ঞতাকে সহজে সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী করে তোলা যায়—জীবনের রূঢ়তম উপাদানকেও সরস করে তোলবাব সেই সামর্থ্য—এঁরা অর্জন করতে পারেন নি। ফলে এঁদের রচনায় সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান থাকা সত্ত্বেও সে রচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে নি। এঁদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। নরেশচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে দুর্লভ বলিষ্ঠতা চোখে পড়ে; কিন্তু সে বলিষ্ঠতার প্রকাশ বড় কাঁচা, বড় অমার্জিত। তাঁর ভাষায় ব্যঞ্জনা সামান্য, তাঁর ভাবনা কৌতুকরসে জারিত নয়। ফলে যদিচ এককালে তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলা লেখক-পাঠকমহলে প্রচুর আন্দোলন হয়েছিল, পরবর্তীদের মনে তিনি বিশেষ দাগ রাখতে পারেন নি।

তবে সত্যসন্ধিৎসা এবং ব্যঞ্জনানৈপুণ্যের সমন্বয় ঘটলে যে কত উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনা সম্ভব, আধুনিক কালে বাংলা ভাষায় তার যে একেবারে কোনো উদাহরণ নেই একথা বলতে পারি না। অন্তত এমন দু'জন লেখকের কথা জানি প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আগে যাঁদের রচনায় বাংলা কথা-সাহিত্যে এক অদৃষ্টপূর্ব মহৎ সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্নদাশঙ্কর রায় কেউই ভাষার ক্ষেত্রে রবিঠাকুরী শুচিবাইএর প্রভাব পুরোপুরি এড়াতে পারেন নি; কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী এবং উপজীব্যনির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে অন্ততঃ তাঁদের প্রথমযুগের রচনায় তাঁরা উভয়েই দেখা দিয়েছিলেন ফরাসী কথাসাহিত্যিকদের সুযোগ্য বাঙালী

উত্তরসাধক রূপে। এঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে স্পষ্টতা এবং প্রতীতি দুই-ই বেশী ছিল; আর তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসামান্য কৌতুকবোধ। "প্রকৃতির পরিহাস" এবং "পুতুল নিয়ে খেলার" মধ্যে তিনি যে দুঃসাহসিক সত্যাগ্রহ, কৌতুকপ্রোজ্জ্বল শুভবুদ্ধি এবং গল্পফাঁদার অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, বাংলা গদ্যসাহিত্যে আজো তার তুলনা আমার চোখে ত' পড়ে নি। তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় কৌতুকরস অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে, তার জায়গায় দেখা যাচ্ছে একটা পীড়াদায়ক গদগদ ভাবালুতা—"কন্যা" বইটিতে ফেনার পরিমাণ এতবেশী যে ভাবতে রীতিমত কষ্ট হয় "পুতুল নিয়ে খেলা" এবং এই বইটির লেখক একই ব্যক্তি—তবু এখনো এই ভাঁটার সময়েও তাঁর ছোট-বড় গল্পগুলির মধ্যে এমন একটি সংস্কারমুক্ত দুঃসাহসী মনের সন্ধান পাওয়া যায় বাংলা গদ্যসাহিত্যে আজো যা নিতান্ত দুর্লভ।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও অসামান্য সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিলেন। জীবনের যে সব দিক নিয়ে ইতিপূর্বে বাঙালী লেখকেরা লেখেন নি, লিখতে চান নি, লিখতে গিয়ে হয় পিছিয়ে এসেছেন আর না হয় সে লেখাকে সাহিত্যের স্তরে ওঠাতে পারেন নি, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় গোড়াতেই সে দিকগুলোকে তাঁর লেখার মূল উপজীব্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের রূপান্তরিত করেছিলেন কথাসাহিত্যের সার্থক উপাদানে। শুধু সততার সামর্থ্যে নরেশ সেনগুপ্ত যা পারেন নি, বৈদগ্ধ্যের সম্পদে তিনি তা' পারলেন। মনোবিকলনের জ্ঞান জীবন-সম্বন্ধে বাঙালী সাহিত্যিকের তৃতীয় দৃষ্টি খুলে দিল। কিন্তু মাণিকের জীবনজিজ্ঞাসার মধ্যে আস্তিক্য বড় কম ছিল। তাই যে সত্যাগ্রহ নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাকে তিনি টিঁকিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁর শেষ সার্থক রচনা বোধহয় "অহিংসা"। মনের মধ্যে প্রত্যয় না থাকায় অবশেষে বাইরের প্রত্যয়ে তাঁকে আশ্রয় খুঁজতে হ'ল; মতবাদের মারাত্মক ব্যাধি শেষ পর্যন্ত তাঁর মুক্তবুদ্ধিকে জীর্ণ করে

ফেলল। লেখক হিসেবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফুরিয়ে গেলেন। তার পর থেকে তিনি যা লিখেছেন, লিখছেন তা' অবিশ্বাস্য রকমের অপাঠ্য। একটি মহৎ প্রতিভার এজাতীয় আত্মহত্যার তুলনা শুধু বাংলা ভাষায় নয়, অন্য কোনো ভাষাতেও সচারাচর চোখে পড়ে না।

আশ্চর্য এই যে তাঁদের প্রতিভার বলিষ্ঠতম প্রকাশের কালেও অন্নদাশঙ্কর এবং মাণিক কি বাঙালী লেখক কি বাঙালী পাঠক কারো ওপরে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেন নি। সুধীমহলে বাহবা কিছুটা পেয়েছেন, কিন্তু সাধারণ মহলে স্বীকৃতি পান নি। ফলে তাঁদের লেখা বাংলা সাহিত্যের মেজাজে কোনো লক্ষণীয় রূপান্তর আনতে পারল না। হয়ত যতটা প্রতিভা থাকলে একটা ঐতিহ্যের ধারা পালটে নতুন ঐতিহ্যের প্রবর্তন করা যায় তা তাঁদের ছিল না; তাঁরা নিজেরা অবসিত হলেন, কিন্তু আমাদের জীবনবোধ জাগ্রত হ'ল না। আমাদের জীবনবিমুখ ভাবাবিষ্ট মনোভাবের প্রশ্রয়ে যেসব লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের মাতব্বর হয়ে উঠলেন তাঁদের লেখায় না রইল নির্মোহ যুক্তির দীপ্তি না নির্ভীক মুক্তির অভীপ্সা। আজকের বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের রুচি এবং বাঙালী লেখক লেখিকাদের মেজাজের হদিশ অন্নদাশঙ্কর রায় কি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে মিলবে না। তার হদিশ মিলবে প্রবোধ সান্যাল, মনোজ বসু জাতীয় লেখকদের জীবনবিমুখ ন্যাকামি, বোকামিঠাসা গল্প উপন্যাসে।

ফলত যে অকুণ্ঠ জীবনবোধ ফরাসী সাহিত্যের অতুল বৈভবের উৎস, বাংলা সাহিত্যে আজো তা ভালো করে শেকড় গাড়তে পারে নি। অথচ বাংলা সাহিত্যকে যদি পরিণত সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে হয়, তবে বাঙালী লেখককে এ বোধ অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আমার ধারণা ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর পরিচয় এই আত্মপ্রস্তুতির ব্যাপারে বাঙালী লেখককে প্রভূত সাহায্য করতে পারে। বহুকাল আগে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুব বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা যে তেমন ফলবতী হয় নি তার একটা প্রধান কারণ বোধহয় এই যে কি তাঁর বাছাইএ, কি তাঁর অনুবাদে ফরাসীর বিশিষ্ট মেজাজটি ঠিক ধরা দেয় নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত ফরাসী কবিতার ভাবানুবাদ বিষয়েও সেই একই অভিযোগ আরো বেশী যথার্থতার সঙ্গে করা চলে। তবে প্রমথ চৌধুবী ফরাসীর অনেকখানি অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্য যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে শুধু "চারইয়ারি কথা" কি বীরবলের প্রবন্ধাবলী নয়, পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের বিকাশ তার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু চৌধুবীমশাইএর অন্তরঙ্গতাও ফরাসী সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার মধ্যে আবদ্ধ ছিল; মনতেনকে পেরিয়ে রাবেলের জগতে তিনিও প্রবেশ করতে পারেন নি। ঠাকুরবাড়ির শ্লীলতাবোধ সম্ভবতঃ সে প্রবেশের পথে বাধা হয়েছিল।

ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী লেখক এবং পাঠকের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাতে হলে সে সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলায় বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার—এবং তার চাইতেও বেশী দরকার সে সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ মূল থেকে বাংলায় তার তর্জমা করা। তার দ্বারা শুধু পাঠকসম্প্রদায় নয়, লেখকসম্প্রদায়ও প্রভূত উপকৃত হবেন। তবে একটা কথা কোন রকমেই ভুললে চলবে না। জীবনবোধের আদি এবং অক্ষয় উৎস বই নয়, জীবন নিজে। সাহিত্য চোখের ঠুলি খসাতে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টি দিতে পারে না। আমাদেব লেখকরা যতদিন না জীবনের বিদ্যালয়ে পাঠ নিতে শিখছেন ততদিন তাঁদের বিদগ্ধ লেখকে পরিণত করে এ সাধ্য কারো নেই—না সে শেক্স্পীয়বের না রাবেলের।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করার পথে দুটি মস্ত বাধা আছে। প্রথমত, সাধারণ রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে খুব কম লোক তাঁর ছবির সঙ্গে পরিচিত। ফলে তাঁর বিশেষ বিশেষ ছবি নিয়ে আলোচনা করলে অনেকের কাছেই তা অবোধ্য ঠেকবে। দ্বিতীয়ত, এই কর্তাভজার দেশে গত তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে এমন একটি বিচার-বিমুখ ভক্তিগদগদ ভাব গড়ে উঠেছে যেটি অন্তত তাঁর আঁকা ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা করার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। কেননা, ছবি-আঁকিয়ে রবিঠাকুর আমাদের চোখে যতই চমক লাগান না কেন, স্বীকার না করে উপায় নেই তাঁর আঁকা ছবি কারো মনে ভক্তিভাবের উদ্রেক করে না। ছবি-আঁকিয়ে রবিঠাকুর আর যাই হোন ঋষি নন। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে ঋষি দেশীবিদেশী পণ্ডিতদেব মুখে বারবার একথা শুনে এ বিষয়ে আমাদের মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে তাঁর ছবি সম্বন্ধে কোনো যথার্থ আলোচনা করতে হলে প্রথমেই এই অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আঘাত হান্‌তে হয়। আর অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধিতা করা যে কি সাংঘাতিক কাজ সক্রেটিস থেকে রামমোহন রায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রেখে গেছেন।

তবু সেই কারণেই আমার বিশ্বাস রবিঠাকুরের আঁকা ছবিগুলি বিষয়ে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ আলোচনা থেকে চিত্রকর বা চিত্রানুরাগীরা কতটা লাভবান হবেন বলা শক্ত, কিন্তু এর ফলে রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের বোধ যে আরো গভীর এবং যথার্থ হয়ে উঠবে তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। কেননা এ ছবিগুলি থেকে শুধু একথাই জানা যায় না যে লেওনার্দো কি মিকে-লাঞ্জেলোর মত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও বহুমুখী ছিল; এরা এ সংবাদও

বহন করে যে রবীন্দ্র-মানস আমাদের মুগ্ধ কল্পনায় যতখানি নিটোল, দ্বন্দ্ববিহীন, সম্পূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়ে এসেছে ঠিক ততখানি তা ছিল না। লেওনার্দোর মত না হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও যে বহুমুখী ছিল, একথা সবারই জানা। কিন্তু সে প্রতিভাও যে পুরোপুরি অন্তর্বিরোধের-হাত এড়াতে পারে নি এ সত্য খুব কম রবীন্দ্রানুরাগীরই নজরে পড়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা নির্ভেজাল ব্রহ্মজ্ঞানী বানিয়ে আমাদের জীবন থেকে বিদায় দিতে না চাই, অন্তরঙ্গতাহীন অমরত্বকেই যদি আমরা শিল্প প্রতিভার চরম পুরস্কার মনে না করি, রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক মনের মধ্যে যোগসাধন যদি আমাদের নিষ্প্রয়োজন না মনে হয়, তবে রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে অন্তর্বিরোধের যে আভাস এই ছবিগুলির মধ্যে পাওয়া যায় তার প্রতি উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। স্বীকার করি এই বিরোধ রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়; তিনি শেক্‌স্‌পীয়র, গ্যয়টে বা ডস্টয়েভ্‌স্কির উত্তরসাধক নন; তিনি মূলত শান্তির, প্রেমের, প্রত্যয়ের কবি। তবু তাঁর জীবনে এবং শিল্প সাধনায় অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা যে একেবারে অবর্তমান ছিল না, জীবনের কোনো একটি অধ্যায়ে তাঁর চেতনা যে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বাঙালী শিল্পী-সাহিত্যিকদের তুলনায় আধুনিক মনের অনেক বেশী নিকটবর্তী হয়েছিল, ছবিগুলির আলোয় তাঁর রচনাবলী ফিরে পড়লে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই অবহেলিত দিকটি সম্ভবত ধরা পড়বে। সুতরাং চিত্রজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে আলোচনা করুন বা নাই করুন (এতাবৎ তাঁরা করেন নি), সৎ রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেরই এদিকে অবহিত হবার প্রয়োজন আছে।

দুই

তাঁর মৃত্যুর পরে আবিষ্কৃত "স্টেলার জন্য জর্ণালে" ডীন সুইফ্‌টের যে চেহারাটি ধরা পড়েছিল তা যেমন অপরিচিত তেমনি অপ্রত্যাশিত।

তাঁর জীবিতকালে সমসাময়িক ইয়াহু-রা তাঁর শাণিত বিদ্রূপকেই চিরদিন ভয় করে এসেছে। কে জান্ত এই মানুষই সসঙ্কোচ জর্নালের পাতায় পাতায় এত মমতা আর অনুরাগ, এত স্বপ্ন আর বেদনা সংগোপনে সঞ্চিত করে রেখেছিল। তাঁর শিল্প যেন কোন জিঘাংসু মনের উদ্যত খড়্গ। আর জর্নালের পাতায় লুকিয়ে আছে এক আর্ত আহত শিশু মুখ—একান্তভাবে সে ভালবাসতে চায়, চায় ভালবাসা পেতে।

সংসারে যারা সুইফ্‌টের মত তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল মানুষ—(আর কি সে সংসার! সন্দেহ, ভয় আর নিষেধকে দেবতা বলে পূজো করাই যার ধর্ম) অনেক সময়েই তারা তাদের জীবনকে এক অবোধ্য, অস্বচ্ছ, স্ববিরোধী উপাখ্যান করে তোলে। যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরাই শুধু নিজেদের ভিতরকার পরস্পর বিরোধী বৃত্তিকে চিনতে পারেন, জানতে পারেন, জটিল এবং জঙ্গম সমগ্রতায় মেলাবার সাধনা করতে পারেন। শ্রেয়-র নামে প্রেয়-কে বলি দেবার বিবেকী প্রলোভনে তাঁরা ধরা দেন না। গ্যয়টের জীবন সত্তার এই সমগ্রতা অর্জনের এক আশ্চর্য সাধনা: ফাউস্টের মত মেফিস্টোফেলেস্‌-ও তাঁরই সত্তার অপর রূপ। টল্‌স্টয়ও একদিন এ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে এক-মনের অসহিষ্ণু দাবি মেটাতে গিয়ে তাঁকে নির্মম অধ্যবসায়ে অপর-মনকে মুছে ফেলতে হয়েছিল।

আমাদের যুগের সার্থকতম জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে এমনিতর প্রচ্ছন্ন তবু গভীর আত্মবিরোধ নিহিত ছিল, তাঁর অনুরাগীবৃন্দ সাধারণত তা স্বীকার করেন না। তিনি নিজেও সে বিষয়ে সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। অন্তত তাঁর প্রকাশ্য জীবনে—আর সাধারণ স্বীকৃতি লাভের পর থেকে তাঁর জীবনের বেশীটাই ত' প্রকাশ্য—এবং সাহিত্যসৃষ্টিতে এ ধরনের আভ্যন্তরীণ বিরোধবোধের চিহ্ন আপাতদৃষ্টিতে বড় একটা চোখে পড়ে না। তবু তাঁর বিচিত্রমুখী

প্রয়াসের বিশেষ একটি ক্ষেত্রে এই বিরোধের উপস্থিতি প্রবলভাবেই স্পষ্ট—আমি তাঁর আঁকা চিত্র এবং স্কেচ্‌গুলির কথা বলছি। এদের মধ্যে যে মুখের আদল ধরা পড়েছে, আমাদের সকলের বিস্মিত বিমুগ্ধ চেনাজানার আপোল্লোনিয়ান মুখশ্রীর সঙ্গে তার সুদূরতম সাদৃশ্যও আবিষ্কার করা কঠিন। তাঁর পরিণত জীবন এবং শিল্পসৃষ্টিকে আমরা সত্যশিবসুন্দর বা হেলেনিক "টো-আগাথন"-এর নিকটতম রূপায়ণ বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু এই ছবিগুলির মধ্যে যাঁকে দেখা গেল তাঁর মেজাজ নিতান্তই ডায়োনিসিয়ান—আদিম এবং গ্রোটেস্ক্‌—সে মুখের রেখাকৃতি জ্যামিতিক সুষমার প্রতিবাদী, তা স্থূল, গুরুভার, অস্বচ্ছ, জান্তব আবেগে থরথর।

এই ছবিগুলির আড়ালে কোনো এক প্রবল এবং প্রাক্‌চেতন অস্বস্তি যেন ওৎ পেতে আছে। প্লেটো দেখলে বলতেন এদের প্রলম্বিত সংসর্গ অস্বাস্থ্যকর, বুদ্ধির গোড়ায় পচ ধরতে পারে। সময়ের যে নগণ্য খণ্ডের নাম সভ্যতার ইতিহাস, এদের জগৎ তা থেকে প্রাচীন, এদের উদ্‌ভব মানবসত্তার প্রাক্‌সাংস্কৃতিক স্তরের গভীরে। চৈতন্যের সাধনা হ'ল এই গভীরকে আলোকিত করা, আমাদের অন্ধ জৈব বৃত্তিগুলিকে সূর্য্যমিত করে সত্তার সামগ্রিক বিকাশের মধ্যে মুক্তি দেওয়া। এ ছবিগুলিতে সে সাধনা শুধু অনুপস্থিত নয়, অস্বীকৃত। এদের আবহাওয়া ভিজে, ভয় দেখানো, বন্য বললেও বুঝি ভুল হয় না,—শ্বাসরোধী, সূর্যবিহীন। দালি কিম্বা এর্‌নস্ট কিম্বা মাঝ-বয়েসী পিকাসোর সচেতন (আর সেই কারণে স্ব-বিরোধী) ছবিগুলির চাইতেও এরা একান্ত এবং মারাত্মকভাবে সুর্‌রিয়ালিস্ট।

আমি জানি আমার এ প্রস্তাব রবীন্দ্রভক্তেরা উষ্মিত উপেক্ষায় নাকচ করতে চাইবেন। এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এতটুকু খর্বিত করার অভিপ্রায় আমার নেই, এ জাতীয় ভাবাবেগকে তাই আমি অশ্রদ্ধেয় ভাবতে পারি নে। কিন্তু ভক্তিতে যদি বা কৃষ্ণ মেলেন,

প্রত্যক্ষের অস্বীকারে জ্ঞান মেলে না। আর দার্শনিক ও শব্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ এবং ছবি আঁকিয়ে রবিঠাকুরের মাঝখানে একটা মস্ত চওড়া খাদের উপস্থিতি বেখাপ্পা চমক্‌লাগানো ভাবেই প্রত্যক্ষ। শুধু চোখ ঠেরে সে খাদের ওপরে সেতু গড়বার ভরসা সামান্য। খাদটা যে অন্তত প্রত্যক্ষ, এটা না মানলে সেতু গড়ার কথাই উঠতে পারে না। সেটা আসলে বাহ্য, না, তাঁর পরিণত সত্তার অনপনেয় চারিত্রিক, তাঁর অন্তর্জীবনের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের সার্থক বিচার সম্ভবপর নয়। সে কাজ এখনো শুরু পর্যন্ত হয় নি। জীবনী এবং স্মৃতিকথা নামে যেসব মালমশলা—বই অথবা প্রবন্ধ আকারে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে প্রধানত কিছু ঘটনার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে খোঁজ মেলে। আমাদের সমসাময়িক বা ভবিষ্যকালের যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তার এই অন্তরকাহিনী লিখবেন, মহৎসৃষ্টির অমরতা যে তাঁর প্রাপ্য পুরস্কার এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে যতদিন না সে তথ্যাবলীর সংগ্রহ, বিচার এবং সুষমিত বিন্যাস ঘটছে ততদিন এই প্রত্যক্ষ স্ববিরোধ সম্বন্ধে নানা রকম আন্দাজ পেশ করবার হয়ত কিছু সার্থকতা আছে। এটা মোটমাট জানা যে অঙ্কন শিল্পরীতিতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোন শিক্ষালাভ করেন নি। যদি বা মাঝ বয়সে শখ করে দু-দশখানা ছবি আঁকার জন্যে অধ্যবসায় করেও থাকেন, সে চেষ্টা মূলত অপরের চিত্রকে মডেল করে ব্যর্থ অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের স্বকীয় অঙ্কনরীতির উদ্ভব বাহ্যত এক ধরনের খেয়াল খেলার মধ্য থেকে। নিজের নানা রচনার প্রথম খসড়া লেখার সময়ে পাণ্ডুলিপিতে যখনি কিছু কাটাকুটি মার্জনার দরকার পড়ত, তখন এই শৌখীন মানুষটি অনেক সময়ে অনবগত মনে সেই কাটাকুটিগুলিকে মোটা রেখায় একত্র সম্বদ্ধ করে দিতেন, আর তারই ভিতর থেকে কখনো কখনো বা নানা অদ্ভুত আকার গড়ে উঠত। এর উদ্দেশ্য আর যাই হোক ছবি আঁকা ছিল না। কাটাকুটির এই

ডিজাইনগুলি ছিল শব্দশিল্পীর প্রকাশ সাধনার মাঝে মাঝে ফাঁক-ভরানোর চিহ্নমাত্র। কিন্তু গোড়াতে যা ছিল অবসর বিনোদন, ক্রমেই তার সম্ভাবনা-সম্পদ প্রবল প্রলোভনের বিষয় হয়ে উঠল; অবশেষে ভালো লাগার খেলা হল ভালবাসার আসক্তি।[১] প্রথম প্রথম প্রবীণ শব্দশিল্পী তাঁর এই নিতান্ত অপরিণত 'প্রণয় নিয়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করতেন—এমন কি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছেও এই নতুন মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল উপস্থিত করতে তাঁর রীতিমত উদ্বেগ ও সঙ্কোচ লাগত। পরে অবশ্য, অন্তত কয়েক বছরের মত, এই নতুন প্রণয়ের হাতে নিজেকে তিনি বেপরোয়াভাবে ছেড়ে দেন—আর এই সময়টায় তাঁর নানা উদ্ভট কাহিনী ও ছড়ার সঙ্গে অজস্র এলোমেলো স্কেচ আঁকা ছাড়াও বিশেষ অভিনিবেশের সঙ্গে নিয়মিতভাবে বহুসংখ্যক রঙ্গীন ছবিও তিনি আঁকেন।[২] শেষ পর্যন্ত বোধহয় এই বেয়াড়া আসক্তিতে তাঁর ক্লান্তি এসেছিল। সে কি এই অপরিচিত মাধ্যমের অন্তর্লোকে কোনোদিনই প্রবেশ করতে পারলেন না, সে কারণে? অথবা যে সব

(১) "তোমাদের বলি, কেমন করে আমি আঁকা সুরু করলুম। কবিতা লিখতে কাটাকুটি করতুম', সেই কাটাকুটিগুলো যেন রূপ নিতে চাইতো, তারা হতে চাইতো, জন্ম নিতে চাইতো। তাদের সে দাবি আমি অগ্রাহ্য করতে পারতুম না। প'ড়ে থাকত লেখা, সেই কাটাকুটিগুলোকে রূপ ফলাতুম, পারতুম না তাদের প্রেতলোকে ফেলে রাখতে। এই ভাবে আমার ছবি শুরু।"

(২) যতদূর জানি ১৯২৫-২৬ থেকে ১৯৩৭-৩৮ এই বছর বারোর মধ্যে রবিঠাকুর তাঁর বেশীর ভাগ ছবি আঁকেন। নেহাৎ কম ছবি আঁকেননি, প্রায় হাজার তিনেক হবে। নন্দলাল বসু লিখেছেন: "প্রায় দশ-বারো বছরের মধ্যেই যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন, তার সংখ্যা গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলাদেশের সমস্ত নামকরা চিত্রশিল্পীরা মিলে যত ছবি এঁকেছেন তার চেয়ে বেশী। তাঁর বহুসংখ্যক ছবির মধ্যে ১৫০০এর বেশী ছবি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।" (প্রভাতবাবুর রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।)

প্রাক্‌চেতনিক তাগিদ তাঁকে ভাষার সচেতন জগৎ থেকে চিত্র পটের অর্ধচেতন জগতের দিকে ঠেলেছে, তারা শেষ পর্যন্ত দুর্বল, অবসিত হয়ে গিয়েছিল ?

তিন

নৃতাত্ত্বিকদের অসীম অধ্যাবসায়ী গবেষণার ফলে এটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে আজ হতে তিরিশ হাজার বছর আগেও মানুষ ছবি আঁকত। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রায় প্রথম থেকেই মানুষ অন্য জীবদের মত শুধু টিঁকে থাকার লড়াইকে নিজের নিয়তি বলে মেনে নিতে পারে নি, সে লড়াইকে আত্মপ্রকাশের সাধনায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছে। এই সাধনারই অন্যতম ফল শিল্প। প্রতি শিল্পেরই নিজস্ব মাধ্যম এবং রীতি-প্রক্রিয়া আছে। যেমন সুরের মাধ্যম ধ্বনি, চিত্রের মাধ্যম রং এবং রেখা, সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। এর মধ্যে সুরের ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং মাধ্যমের সম্পর্ক সব চাইতে অপরোক্ষ এবং সে কারণে সঙ্গীতে স্ববিরোধ এবং আত্ম-সচেতনতা সবচাইতে কম। অপর পক্ষে যেহেতু ভাষা সমাজ-নির্ভর, সে কারণে সাহিত্যে, বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যে, শিল্পী এবং মাধ্যমের সম্বন্ধ স্পষ্টত পরোক্ষ এবং ফলে সাহিত্য-কল্পনায় স্ব-বিরোধ এবং আত্ম-সচেতনতা এক রকম অনিবার্য। চিত্র শিল্পের প্রকৃতি সম্ভবত এ দু'এর মধ্যবর্তী।

আলতামিরার গুহায় আঁকা জীবজন্তুর যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের মার্ক্ চাগাল্ কি যামিনী রায় পর্যন্ত নানা দেশের চিত্রশিল্পীরা যে নানা মেজাজে নানা রীতিতে ছবি এঁকেছেন, মোটামুটি তা থেকে চিত্রশিল্পের তিনটি মূল ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম ধারাটি ছন্দপ্রধান, দ্বিতীয়টি রূপপ্রধান এবং তৃতীয়টি সাদৃশ্যপ্রধান। অবশ্য সব সৎ ছবিতেই ছন্দ, রূপ এবং সাদৃশ্য তিনটি লক্ষণই মিলেমিশে কমবেশী উপস্থিত থাকে। তবে কারোর সমগ্রতা-বা ছন্দের ওপরে বিশেষ

করে নির্ভর করে, কারো-বা রূপের ওপরে, কারো-বা সাদৃশ্যের। কথার সাহায্যে এ পার্থক্য ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে উদাহরণ দিলে হয়ত প্রভেদটা স্পষ্টতর হবে। চীনে-ছবি বিশেষ করে ছন্দ-প্রধান, ভারতীয় ছবি অজন্তা বাব থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত রূপ-প্রধান এবং রেনেসাঁস থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিম ইয়োরোপের চিত্রকলা মুখ্যত সাদৃশ্য প্রধান। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবশ্য উপরোক্ত বিবরণের ব্যতিক্রম আছে। তবে ব্যতিক্রমের দ্বারা সাধারণ প্রস্তাব বাতিল হয় না, মার্জিত হয় মাত্র। প্রাচীন চীনদেশের শিল্প-শাস্ত্রে ছন্দকে শিল্পের প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিয়েহ্ হো একেই বলেছেন চি-ইয়ুন্ শেঙ্-টুঙ্। পেত্রুচ্চি একে অনুবাদ করেছেন la consonance de l'esprit engendre le mouvement বলে। ওকাকুরা আরো স্পষ্ট এবং সরল ভাষায় একে বলেছেন rhythmic vitality. অপর পক্ষে ভারতীয় বৌদ্ধ এবং হিন্দু শিল্পী ও শিল্পাচার্যদের আলেখ্যে এবং শিল্পালোচনায় রূপের দিকটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। হিন্দু শিল্প-শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণনা আছে কি.ভাবে শিল্পী আকাশ থেকে বস্তু-সম্পর্কহীন বা অ্যাবস্ট্র্যাকট্ রূপকে ধ্যানযোগে আকৃষ্ট করে বাহ্য মাধ্যমে আকার দান করেন। এ কল্পনার সঙ্গে পিথাগোরাস এবং প্লেটোর দর্শনের মিল সহজেই চোখে পড়ে। পরবর্তী কালে যশোধর পণ্ডিত কামসূত্রের টীকা করতে যেয়ে চিত্রের যে ষড়ঙ্গের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্তত চারটি অঙ্গ মুখ্যত রূপ সংক্রান্ত : রূপভেদ, প্রমাণ, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ। এ দেশের ছবিতেও অবশ্যই ছন্দ আছে—ছন্দ ছাড়া কোন শিল্পই সম্ভব নয়—কিন্তু তার ঝোঁকটা রূপের ওপরে। অপর পক্ষে পশ্চিম ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় চারশ' বছর ধরে যে শিল্পরীতি বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তার সবচাইতে বিশিষ্ট লক্ষণ হোল verisimilitude বা সাদৃশ্যসত্য গুণ। ফান আইক বা উচ্চেল্লোর আলেখ্যে.কি পিসানেল্লোর রেখাঙ্কনে ছন্দ এবং রূপ দুইই

আছে। কিন্তু যে গুণটি বিশেষ করে এঁদের আঁকাকে সজীব করেছে সেটি সাদৃশ্যের যাথার্থ্য। পরবর্তী কালে এই সাদৃশ্য সাধনা বিভিন্ন ধারায় আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে ডুয়েরের, তিৎজিয়ানো, এল্ গ্রেকো, রুবেন্স্, রেম্ব্রাণ্ট ইত্যাদির ছবিতে।

এখন রবীন্দ্রনাথের ছবি এই তিনটি মূল ধারার কোনটির মধ্যেই পড়ে না। তাঁর বহু ছবিতেই প্রাণ আছে, কিন্তু প্রায় কোন ছবিতেই ছন্দ নেই। যাঁর ব্যক্তিত্বের আর সব রকম প্রকাশের মধ্যেই ছন্দ ছিল, তাঁর ছবিতে ছন্দ নেই এ কথা বললে ভক্তরা নিশ্চয়ই আমার বক্তব্যকে সঙ্গে সঙ্গে খারিজ করে দেবেন। তবু যদি কেউ খোলা চোখে তাঁর ছবির পাশে সুঙ্গ যুগের যে কোনো চীনা চিত্রকরের ছবি দেখেন তা হলে আমার কথাটি হয়ত একেবারে নিরর্থ ঠেকবে না। এ তুলনা যদি অসঙ্গত ঠেকে তবে তাঁর প্রায় সমসাময়িক শিল্পী মার্ক চাগালের ছবির সঙ্গে তাঁর ছবি মিলিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। দু'জনেরই চিত্রকল্পনায় পুতুল, পাখী, পশু, স্বপ্নলোকের কিম্ভূতকিমাকারেরা আসর জমিয়েছে; কিন্তু চাগালের হাতে তারা হয়ে উঠেছে ছন্দময়। চাগালের ছবির যেটি বিশেষ লক্ষণ, রেনি শ্বব্ যাকে বলেছেন, "ভালবাসা", হর্বর্ট রীড যাকে বলেছেন গীতধর্ম, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তার কোনো আভাস মেলে না।

ছন্দ নেই, কিন্তু রূপ? না, রং এবং রেখার উপাদানে রূপের সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করতে পারেন নি। রূপের সাধনায় রেখাই প্রধান, রং দ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথের রেখার হাত কাঁচা। কত কাঁচা পাকা শিল্পীদের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রিমিটিভ্ শিল্পের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। আমাদের শিল্পাচার্যরা যাকে বলেছেন রূপভেদ, রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনদিনই আয়ত্তে আনতে পারেননি। অপর পক্ষে দু' একটি ছবি বাদ দিলে তাঁর অধিকাংশ ছবির বর্ণিকাভঙ্গ অত্যন্ত স্থূল এবং সীমাবদ্ধ। তাতে না আছে মাতিসের বিশুদ্ধ বর্ণ-প্রয়োগ সঞ্জাত

উজ্জ্বলতা, না আছে অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রং-মেশানোর ব্যঞ্জনা। ফলে রং এবং রেখাকে আশ্রয় করে যে লাবণ্য দেখা দেয় রবীন্দ্রনাথের পটে তার ক্বচিৎ সঞ্চার ঘটেছে।

আর সাদৃশ্য সত্যের অনুসন্ধান এবং চর্চা যে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সাধনার বিষয় ছিল না, তাঁর কিছু ছবিও যিনি একবার দেখেছেন তিনিই জানেন। এদিক থেকে তাঁর ছবির মেজাজ নিতান্ত আধুনিক। তবে আধুনিকদের সঙ্গে তফাৎটা শুধু এই যে আধুনিকেরা বস্তুরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমা অর্জন করে স্বেচ্ছায় সাদৃশ্য চিত্রণের পথ ত্যাগ করেছেন— আর তার জায়গায় ঝোঁক দিয়েছেন ছন্দ এবং রূপের ওপরে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রমা এবং পরিপ্রেক্ষিতের একান্ত অভাব ; কিন্তু ছন্দ অথবা রূপেব দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হয় নি।

চার

সুতরাং একথা এক রকম নিশ্চিত করেই বলা যায় যে চিত্রশিল্পের স্বকীয় সাধনা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম ছিল না। তবে তাঁর এই ছবি এবং স্কেচগুলিতে এত গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন কি ? মহৎ প্রতিভার সাময়িক অবসর বিনোদন বলে তাদের বরখাস্ত করলেই ত হয়।

না, তা হয় না। হাজার অস্পষ্টতা সত্ত্বেও এই ছবি এবং স্কেচগুলির মধ্যে এক প্রবল দুর্বোধ্য শক্তির উপস্থিতি আমাদের সত্তাকে আলোড়িত করে। যদি নাও জানা থাকত যে এদের স্রষ্টা একজন মহাকবি, তবু এরা নিজেরাই এদের বোবা বিক্ষোভের জোরে আমাদের আকৃষ্ট করত। রবীন্দ্রনাথের যৌবন এবং প্রথম প্রৌঢ় বয়সের বহু গদ্য-পদ্য রচনায় যার আভাস পাই নে এই ছবিগুলিতে সেই ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। এরা বোবা তবু জীবন্ত। আর যাই সম্ভব হোক এদের নিরর্থ বলে অবহেলা করা কঠিন।

যে ঐতিহ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে, তার

নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও একটা জায়গায় মস্ত দুর্বলতা ছিল। মানুষের কতকগুলো মৌল বৃত্তি, তাগিদ এবং জৈব ক্রিয়াকে পরম যত্নে অবদমিত করাকেই সে ঐতিহ্য আত্মসংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলে বিশ্বাস করত। অথচ আমাদের মননশক্তি কিম্বা প্রতীকী সাধনার তুলনায় এই জৈব বৃত্তিগুলি কিছু আর ব্যক্তি সত্তার কম গভীরে ওতপ্রোত নয়। ফলে কোন সংস্কৃতিই এদের উচ্ছেদ করতে পারে না, কিন্তু চেতনার স্তরে এদের প্রতি সঙ্কোচ সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ ক্ষেত্রে জৈব বৃত্তির এই অবদমন, নীতি এবং কর্তব্যের নামে সমর্থিত হয়ে থাকে। আর এই অবদমনকে মেনে নেওয়ার নামকরণ হয় বিবেক। সূক্ষ্মবোধ সম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় নীতি বিবেকের বদলে সৌন্দর্য এবং পরিমিতি বোধের তাগিদে এই অবদমনকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে স্বদেশী আত্মনিগ্রহাশ্রয়ী ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ভিক্টোরিয় শ্লীলতা ব্যাধি, ব্রাহ্ম পিউরিট্যানিজ্‌ম্ এবং উপনিষদী ব্রহ্মতত্ত্ব, শিল্পের ধ্রুপদী আদর্শ আর বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টির রোমান্টিক অভীপ্সা। এই সমবেত ধারাগুলির রসে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র পুষ্টি লাভ করেছে। তাঁর জীবনশিল্পে বাস্তবের অসুন্দর দিকগুলি ক্রমশই সযত্ন-বর্জিত। যে ধ্বনি সুরের সঙ্গতিতে বিঘ্ন ঘটায়, যে আবেগ ব্যঞ্জনার সুমিতিতে রসবস্তু হয়ে ওঠে না, যে বিক্ষোভ কল্পনার কাঠামোয় ভাঙ্গন আনে— তাঁর রূপসাধনায় তারা অপাংক্তেয়। বাইরে থেকে তাদের তিনি সংযত করতে চেয়েছেন, ভিতর থেকে তাদের তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন নি।

কিন্তু সব জৈবরূপের মতই ব্যক্তি-অস্তিত্বেরও একটা সামগ্রিক সত্তা আছে। এই সমগ্রতায় যা ওতপ্রোত কোনো উপায়েই তাকে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিত করা যায় না। সে উৎপাটনের চেষ্টায় সমগ্রতারই বিনাশ ঘটে। আর যেহেতু মানুষের ক্ষেত্রে এই সমগ্রতাকে প্রতিষ্ঠিত, পুষ্ট এবং বিকাশের দিকে পরিচালিত করার বিশেষ মাধ্যম তার চৈতন্য, সে কারণে তার জৈব সত্তার সবক'টি মূল

ধারাই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তার চৈতন্যের ওপরে নিয়ত ক্রিয়াশীল। সে ক্ষেত্রে হয় ব্যক্তিমানুষ এই সব ধারাকে চেতনার স্তরে স্বীকার করে নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে নিজের সামগ্রিক বিকাশে তাদের স্ফূর্তির ব্যবস্থা করে, নয়ত চেতনার স্তরে অস্বীকৃত ধারাগুলি প্রাক্‌চেতনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির সচেতন বিকাশ সাধনাকে পদে পদে ব্যাহত করতে থাকে। বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের রুচি জৈব সত্তার এই সামগ্রিক সত্যকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করতে পারে নি। এ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা গ্যয়টের তুলনায় অসম্পূর্ণ। তাঁর জীবন শিল্পে মেফিস্টোফেলেস ফাউস্টের মত স্বীকৃত আত্মীয় নয়। গ্যয়টে যে "অন্ধকার আকুতি"কে (ডুঙ্ক্‌লেন ড্রাঙ্গে) বোঝবার জন্য সারাজীবন সাধনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তা আমাদের মনুষ্যত্বের সাময়িক স্খলন মাত্র।

কিন্তু চেতনার স্তর থেকে নির্বাসন দিলেই কিছু এই সব প্রাক্‌-চেতন জৈব বৃত্তি নিষ্ক্রিয় বা প্রশমিত হয়ে যায় না। তারা নানা-ভাবে নিজেদের প্রকাশ দাবি করে, ব্যবহারে কল্পনায় ক্রমাগতই অন্তর্বিরোধ আনে, আদর্শ বোধে একটু শিথিলসমাধিত্ব ঘটলেই চৈতন্যের ডিজাইনে ওলটপালট ঘটায়। আমার সন্দেহ হয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার মধ্যে তাঁর সযত্ন নিরুদ্ধ প্রাকচেতনিক সত্তা এমনিতর কোন অপ্রস্তুত প্রকাশ লাভ করেছে। তাঁর জীবনের ঐ বিশেষ অধ্যায়ে কেন এই বিস্ফোরণ ঘটল, যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তা বলা কঠিন। হয়ত ঐ বিশেষ বয়সে তাঁর অপ্রকাশ্য জীবনে এমন কোনো প্রবল আলোড়ন সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল যাকে তিনি গ্যয়টের মত করে ভাষাশ্রয়ী চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। হয়ত বা যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মানব সভ্যতার বিশ্বব্যাপী আত্যন্তিক সঙ্কটের শুভনাস্তিক সান্নিধ্যে সাময়িকভাবে তাঁর শ্রেয় বোধে শৈথিল্য এসেছিল। ছবির ভিতর দিয়ে তিনি কি সেই

দুঃসহ বিক্ষোভের হাত থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন? তাঁর ছবির মধ্যে যে প্রবল প্রাণশক্তি আমাদের মনে আলোড়ন আনে, এই অন্ধ বিক্ষোভই কি তার উৎস? চৈতন্যের স্বীকারে আলোকিত নয় বলেই কি সে ছবির জগতে এত গুমোট অন্ধকার?

এ চিত্র চর্চার উৎস যে প্রাক্‌চেতনিক শুধু বাইরের লক্ষণগুলি থেকে তা অনুমান করা যায়। তাঁর রঙে আলোর আভাস ক্বচিৎ। অনেক ক্ষেত্রেই তা এক ধরনের আঁধার সবুজের কাছ ঘেঁষা, যেন গভীর অরণ্যের নিভৃতে সূর্যস্পর্শহীন গুল্মের মত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ফ্যভিস্ত্ বর্ণপ্রয়োগরীতির সঙ্গে বুঝি বা কিছু আত্মীয়তা আছে। কিন্তু এখানে রঙের মধ্যে মুগ্ধ বিস্ময়ের কোন আভাস নেই। বরং গুমোট অস্বস্তির ভাবটাই প্রবল। তাঁর ছবির রঙে বৈচিত্র্য সামান্য, বিভঙ্গে পরিচ্ছন্নতার অভাব। পশু পাখীর প্রতীকী নক্সা একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। যেখানে মানুষের মুখাকৃতি আঁকার চেষ্টা করেছেন সেখানেও মনে হয় সে মানুষেরা যেন আলো-হাওয়া-আকাশের খবর রাখে না। তাদের বাইরের রেখাবিন্যাসে ছন্দ সঞ্চার ক্বচিৎ, তাদের অন্তর্লোকে আনন্দের স্বাদ নেই। তাঁর কালিতে আঁকা রেখাচিত্র-গুলিতে প্রায়শই রেখার বাহুল্য আছে, বিন্যাস নেই; তাদের অধিকাংশেরই পশ্চাৎপটে রেখার অরণ্য, কখনো বা তা এগিয়ে এসে ছবিকেই গ্রাস করেছে। তাঁর অধিকাংশ ছবিই প্রাণ শক্তিতে প্রবল; কিন্তু সে প্রাবল্য মননের দ্বারা সংস্কৃত নয়। তাই তার প্রকাশ শুধু অন্ধ বিক্ষোভে।

কল্পনা করতে কৌতূহল হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর প্রাকৃচেতনিক সত্তাকে অবদমিত না করে চৈতন্যের স্তরে তাকে শিল্পধ্যানের উপজীব্য করতে পারতেন, তাহলে তাঁর শিল্পসাধনা কোন ধারায় বিকশিত হোত। সে ক্ষেত্রে সম্ভবত চিত্রের মাধ্যমে নিষ্ফল অধ্যবসায়ে অবক্তব্যকে আকার দেবার প্রয়োজন ঘটত না। হয়ত শব্দশিল্পে তাঁর দুর্লভ ক্ষমতার ফলে

তিনি প্রাক্‌চেতনকে প্রতীকী প্রকাশ দেবার উপযোগী কোন অভিনব রচনারীতির উদ্ভব করতেন। ইংরেজী সাহিত্যে জয়েস তাঁর অসমাপ্ত এপিক উপন্যাস "ফিনেগানস ওয়েকে" যে অকল্পিতপূর্ব সাহিত্য রূপের অস্পষ্ট সূচনা করেছিলেন, বাংলা ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধতর কল্পনায় তা কি কোন সার্থকতর পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রকাশ পেত? হয়ত এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। মোটের উপর চেতনার স্তরে স্বীকৃত ধ্রুপদী বিবেকের নির্দেশ লঙ্ঘন করায় তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। চিত্র চর্চার ভিতর দিয়ে তিনি শুধু সাময়িকভাবে সে নির্দেশকে সসঙ্কোচে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

॥ **পুনশ্চ** ॥

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আমি প্রথম প্রবন্ধ লিখি ইংরেজিতে, ১৯৪৬ সালে। পরে সেই লেখাটিকেই বাড়িয়ে গুছিয়ে বাংলায় এই প্রবন্ধটি খাড়া করি। সে সময়ে প্রভাত বাবুর "রবীন্দ্র জীবনী"তে ওপর-ওপর চোখ বুলিয়েছিলাম, কিছু খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে পড়িনি। সম্প্রতি বইটি আবার ভাল করে পড়াব ফলে দুটি তথ্য আবিষ্কার করলাম—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন মুক্ত মন নিয়ে আলোচনা বাংলাভাষায় আর কেউ করেন নি; এবং আমি আমার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনে অপ্রকাশ্য সংঘাত বিষয়ে যে সন্দেহ করেছিলাম তা হয়ত একেবারে ভিত্তিহীন নয়। প্রভাত বাবু অবশ্য এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি; তাঁর চিন্তা যেমন সংস্কারমুক্ত তাঁর লেখনী তেমনি সংযত। ফলে আমার মূল প্রবন্ধের সঙ্গে টীকা সূত্রে এখানে যে ভাবনাটুকু জুড়ে দিচ্ছি তার জন্য প্রভাত বাবুর বইটির কাছে ঋণ স্বীকার করেও একথা বল দরকার মনে করি যে, এ ভাবনার দায়িত্ব পুরোপুরি আমার,—তাঁর নয়।

রবি ঠাকুরেব ছবি আঁকার পর্ব সুরু হয় ১৯২৫-২৬ সালে। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অসুস্থ শরীরে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার দিকে যাত্রা করেন। পেরুতে নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু শরীর বেশী খারাপ হওয়ায়

শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনাতেই দু'মাস (৭ নবেম্বর, ১৯২৪—৪ জানুয়ারী ১৯২৫) বিশ্রাম নিয়ে পথে ইতালি ঘুরে দেশে ফিরে আসেন। আর্জেন্টিনাতে একটি মেয়ে তাঁকে সেবাযত্ন করতেন, তাঁর নাম বিত্তোরিয়া ও এস্ত্রাদা। রবীন্দ্রনাথ এঁর নাম দিয়েছিলেন "বিজয়া"; "পূরবী" কাব্যগ্রন্থ এঁকে উৎসর্গ করেন। আর্জেন্টিনাতে যাবার পথে এবং সেখানে থাকা কালে তাঁর মনে কোন্ ভাব বিশেষ প্রবল হয়েছিল, তার খোঁজ আছে "যাত্রী" এবং "পূরবীতে"। প্রভাত বাবু লিখেছেন "যাত্রীর ডায়ারিতে এই প্রেমের তর্কই অনেকখানি জুড়িয়া; মানুষ জীবনে এই ভালোবাসারই প্রার্থী—'ধন নয়, মান নয় সুধু ভালোবাসা' —কবির নিঃসঙ্গতার আকাঙ্ক্ষা" (রবীন্দ্র জীবনী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫২)। "পূরবী"র অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের কবিতা। আর্জেন্টিনায় দুমাস থাকার মধ্যে তিনি ছাব্বিশটি কবিতা লেখেন। "যাত্রীর" এক জায়গায় লিখেছেন, "এবার ক্লান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে বেরিয়েছিলুম; তাই অন্তরে যে নারীপ্রকৃতি অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে বাস করে, মনে মনে সে আপন ঘরের দাবি জানাবার সময় পেয়েছিল" "বিজয়া"-কে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন।

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্য-সুধায়......

"বিজয়া" তাঁকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে তাঁর জীবনের "প্রথম ফাগুন মাসে"র কথা, মনে করিয়ে দিয়েছে যে "ভালবাসার পূর্ণতা ··মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরমপ্রকাশ।...এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী।" কিন্তু তাতে কি হবে, রবীন্দ্রনাথ গ্যয়টেও নন্ ইয়েট্স্‌ও নন, তিনি শেলীর জাতের কবি। সুতারং

"তোমার পানে নিবিড় টানে বেদন ভরা মুখ
মনকে আমার রাখে যেন নিয়ত উৎসুক।
চাইনা তোমায় ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে,
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও নয় খাঁচাটার থেকে।"

কথাটা আরেকটু তীব্র সুরে বলেছেন "আকাঙ্ক্ষা" কবিতায় ঃ

"পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কইনে খুলে
ভুলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো, যেয়ো ভুঁলে।"

কিন্তু ভুলতে চাইলেই ভোলা সহজ নয়। "বিজয়া" যে রবীন্দ্রনাথের অপ্রত্যক্ষ জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে ছিল তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে পূরবীর কবিতাগুলি পড়ার পর প্রতিমা ঠাকুরের "নির্বাণ" বইটি পড়লে। প্রতিমা দেবী লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজেই বলেছিলেন, "এই বিদেশিনীর মধ্যে দেখেছিলুম সেই অনুরাগের আগুন।" মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় বিক্তোরিয়াকে তাঁর বিশেষ করে মনে পড়েছিল, তাঁর পাঠানো আরাম কেদারায় তিনি সমস্ত দিনই প্রায় বসে থাকতেন। "শেষ লেখায়" পঞ্চম কবিতাটিতে এঁকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছেন ঃ

"বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।"

"ভাষা যার জানা ছিল না কো
আঁখি যার করেছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।"

এখন এসব পড়ে যদি মনে প্রশ্ন ওঠে রবীন্দ্রনাথের চিত্র চর্চার সঙ্গে

বিক্তোরিয়ার কোনো নিগূঢ় প্রাক্‌চেতন সম্পর্ক আছে কি না তবে তাকে কি অভদ্র কৌতূহল বলে উড়িয়ে দিলেই কর্তব্য শেষ হবে। সুকুমার সেন লিখেছেনে, "পূরবীর" কবিতা রচনার কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পে মন দিলেন। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮)। তিনিও লক্ষ্য করেছেন যে "রবীন্দ্রনাথের রঙিন ছবিতে বাহিরের সূর্যালোকিত জগতের নিত্যপরিচিত রঙ নাই, যে রঙ আছে তাহাতে যেন মৃত্যুগহ্বরের ভূমিগর্ভের দেহ-অভ্যন্তরের মনোগহনের দুঃস্বপ্নের কালো ছায়া মিশিয়াছে" (ঐ পৃঃ ১৪০)। বিলম্বে যে "ফাগুন মাস" এসেছিল তাকে ভোলার চেষ্টার সঙ্গে এই "মনোগহনের দুঃস্বপ্নের" কোনো সম্পর্ক আছে কি? এই সঙ্গে স্মরণীয় "যোগাযোগ" লেখা হয় ১৩৩৪ সালে, ১৩৩৫এ "শেষের কবিতা"। "যোগাযোগে" রবীন্দ্রনাথ কামনার আর্ত রূপটি উদ্‌ঘাটিত করার যে চেষ্টা করেছেন, তাঁর অন্য কোনো রচনাতেই তার তুলনা মেলেনা। সে রূপ সহ্য করতে না পেরেই যেন তিনি "শেষের কবিতার" মিষ্টি মোলায়েম বাক্‌চাপল্যে আশ্রয় খুঁজলেন। এই সময়ে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, "আজকাল রেখায় আমায় পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে।...তার রহস্যের অন্ত নেই।" (১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫)। "যোগাযোগে" ভাষার মাধ্যমে যা প্রকাশ করতে যেয়ে সহ্যশক্তিতে কুলোয় নি, "শেষের কবিতা" এবং "মহুয়ায়" যাকে শুধু ওপর ওপর ছুঁয়ে গেছেন, ছবির মধ্যে তাকেই কি তিনি আকার দিতে চেয়েছিলেন?

বিক্তোরিয়ার সঙ্গে কবির আবার দেখা হয় ইয়োরোপে ১৯৩০ সালে। এখানে প্রধানত এঁরই আগ্রহে এবং খরচায় পারীতে ২রা মে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়। ইয়োরোপে থাকা কালে কবি বিস্তার ছবি আঁকেন—বোধহয় একসঙ্গে এত বেশী ছবি তিনি আর কোনো সময়েই আঁকেন নি। এই সময়েই তাঁর মনে যে ভাবটি

প্রধান হয়ে ওঠে তার আভাস পাওয়া যায় অল্পকিছুকাল পরে আমেরিকায় বসে লেখা "বাণী" কবিতাটির মধ্যে ঃ

অস্তিত্বের গহনতত্ত্ব ছিল মূক বাণীহীন
অবশেষে একদিন
যুগান্তরের প্রদোষ আঁধারে
শূন্য পাথারে
মানবাত্মার প্রকাশ উঠিল ফুটি'।
মহাদুঃখের মহানন্দের
সংঘাত লাগি চিরদ্বন্দ্বের
চিৎপদ্মের আবরণ গেল টুটি'।

ভাষার ক্ষেত্রে এ আবরণ কোনোদিনই পুরোপুরি টুটল না। আবরণ খসিয়েও যাতে ধরা না পড়েন, তাই কি আশ্রয় খুঁজেছিলেন রং-রেখার অভিধামুক্ত ভাষায় ?

রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে

রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করে লিখেছিলেন আমাদের দেশের সাহিত্য আলোচনা "নিতান্ত মুদীর দোকানের ব্যাপার—ছোট ছোট শালপাতার বন্দোবস্ত—সমালোচনার ভঙ্গী 'দেখলেই সেটি বোঝা যায়—নিতান্ত গেঁয়ো রকমের।" নানা ভাষায় লেখা নানা সাহিত্যের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভালো পরিচয় আছে জেনে তাঁর কাছে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন: "কাব্যকে, সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন?" কবির আরও অনেক প্রস্তাবের মত এটিও বিশেষ কার্যকরী হয়নি। সাহিত্যের পাঠক হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বনাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য বিচারের প্রৌঢ়ত্ব তিনি অর্জন করেন নি। তিনি নানা ভাষা থেকে বিস্তর কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেছিলেন; অন্যান্য ভাষার বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছন্দ নিয়ে বাংলা ভাষায় তিনি যে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন আজও তার তুলনা মেলে না; তাঁর অধুনা দুষ্প্রাপ্য রচনা "ছন্দ সরস্বতী" বাংলা সাহিত্যের একটি মহৎ সম্পদ। তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তাঁর সাহিত্য চর্চার মধ্যে পরিণত বিচার বোধের বিশেষ অভাব ছিল। যাঁদের সে অভাব ছিল না—যেমন প্রমথ চৌধুরী অথবা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—তাঁরাও বিশ্বভূমিকায় বাংলা সাহিত্য সমালোচনার কাজে বিশেষ যত্নশীল হননি। ফলত বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য বিষয়ে কবির উপরোক্ত অভিযোগ আজও কম-বেশী অপ্রতিখণ্ডিত রয়ে গেছে।

অবশ্য বিশ্বভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দেখালে বিশ্বকে দেখাবার মত বাংলা সাহিত্যের কতটুকু যে শেষ পর্যন্ত টিকবে বলা শক্ত। ছোট কি মেজো-সেজোদের কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলা এমন কি আধুনিক ভারতের যিনি নিঃসন্দেহে সব চাইতে বড় লেখক সেই রবীন্দ্রনাথের কথাই যদি

ধরা যায় তা'হলেও বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান কত উঁচুতে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে। নাট্যকার হিসেবে তিনি কি ইউরিপিদেস্, শেক্সপীয়র, মলিএর, ইবসেন, অথবা ও'নীলের সমতুল্য? ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁকে কি স্তাঁদাল, ডস্টয়েভ্স্কী, টলস্টয়, টমাস মান অথবা প্রুস্ত্-এর কোঠায় ফেলা চলে? এমন কি এত যে তাঁর কবি খ্যাতি তা সত্ত্বেও একথা কি আমরা বলতে পারি যে রাঁবো, রিল্‌কে বা ইয়েট্‌স জীবনের যে সব অতলস্পর্শ অভিজ্ঞতাকে তাঁদের সার্থকতম কবিতার মধ্যে ধরতে পেরেছিলেন রবিঠাকুরের কবিতায় তাদের সন্ধান মেলে? তিনি যত গান বেঁধে ছিলেন পৃথিবীতে কেউ বোধ হয় কখনও একা অত গান বাঁধেনি। তাঁর সে গানে আমরা মুগ্ধ। তবু মুখ্যত সুরের দিক থেকে বিচার করলে কি এদেশের কি পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের রচনার সঙ্গে তার কি সত্যিই কোন তুলনা সম্ভব? আমি যতটুকু বুঝি তাতে মনে হয় এক ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বের প্রধানদের অন্যতম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি আখ্যা দিয়ে এদেশে যাঁরা তাঁর গরবে গরবী, বিশ্বভূমিকায় তাঁর এ ধরণের মূল্যায়নের সম্ভাবনায় তাঁদের মন উঠবে ভরসা হয় না।

তবে এক ব্যাপারে বিশ্ব সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা শক্ত। প্রতিভার এমন নৈসর্গিক বহুমুখীনতা এবং প্রাচুর্য আর ক'জন সাহিত্যিক এতাবৎ দেখাতে পেরেছেন? পৃথিবীর প্রাচীন এবং আধুনিক সেরা লেখকদের কথা, যতটুকু জানি, একে একে ভেবে দেখেছি। তাঁদের অনেকে আপন আপন ক্ষেত্রে তাঁর তুলনায় বেশী সার্থকতা অর্জন করেছেন। কিন্তু এত বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁরা কেউই সার্থক হননি, এমন কি বিচরণ পর্যন্ত করেননি। না, দান্তে নয়, সেক্সপীয়র নয়, টলস্টয় নয়। পশ্চিমী রেনেসাঁসের যুগে যাকে বলা হোত বৈশ্বিক মানব বা l'uomo universale সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তারই আশ্চর্য উদাহরণ। রেনেসাঁসের যুগে এ ধরণের কিছু মানুষ দেখা গিয়েছিল,

এঁদের মধ্যে অলবর্তি এবং লেওনার্দো সমধিক খ্যাত। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ মুখ্যত সাহিত্যিক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত সাহিত্যিক এবং সাহিত্যের এমন কোন রূপই আমাদের জানা নেই যার মধ্যে তাঁর প্রতিভা স্ফূর্তি পায়নি। কবিতা, নাটক (ট্রাজেডি, কমেডি, নৃত্যনাট্য, প্রহসন), উপন্যাস, ছোট এবং বড় গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ডায়েরী-চিঠিপত্র—কিছুই তিনি বাদ দেননি। এমন কি দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস, শিক্ষাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ এ সব বিষয়েও তিনি যথেষ্ট ভেবেছেন এবং নেহাৎ কম লেখেন নি। তাছাড়া তাঁর গান আছে, ছবি আছে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমিদারী চালিয়েছেন, একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তাঁর নিজের নানা নাটক প্রযোজনা করেছেন, এমন কি সাময়িকভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। না, রবীন্দ্রনাথের মত বিচিত্রপ্রতিভা সাহিত্যিক এদেশে কেন গোটা পৃথিবীতে আর চোখে পড়ে না। শুধু একজন ছাড়া। সে একজন হলেন যোহান্ হ্বোল্ফ্গাঙ্গ্ গ্যয়টে।

দুই

বিশ্বভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের বিচার করতে গেলে গ্যয়টের কথা আপনা থেকেই মনে পড়ে। গ্যয়টেও মুখ্যত সাহিত্যিক এবং তাঁর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মতই বিচিত্রমুখী। গদ্য এবং পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত; জার্মান সাহিত্যের প্রায় এমন কোন বিভাগ বা শাখা প্রশাখা নেই, যার ওপরে তাঁর প্রতিভা আপন স্বাক্ষর রাখেনি। তিনিও কিছুকাল চিত্রকলার চর্চা করেছিলেন; তবে রবীন্দ্রনাথের মত বৃদ্ধ বয়সে নয়, প্রথম যৌবনে। তাঁর বিজ্ঞান সাধনা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অধিকতর তন্নিষ্ঠ; উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং অঙ্গসংস্থান শাস্ত্রে তাঁর গবেষণা

সমকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল ; এমন কি পদার্থ বিজ্ঞানও তাঁর নজর এড়ায়নি। রবীন্দ্রনাথ যেমন গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বভারতী, গ্যয়টেও তেমনি গড়ে তোলেন হ্বাইমারের রঙ্গমঞ্চ। শুধু কি তাই ? মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি হ্বাইমারের অন্যতম মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। অর্থ, কৃষি এবং খনিজ সম্পদের দপ্তর তাঁর অধীনে ছিল। দশ বছর ধরে এ দায়িত্ব তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিস্তর চিন্তা এবং চেষ্টা করেছিলেন। ফলত রবীন্দ্রনাথের মত গ্যয়টেও ছিলেন জীবন শিল্পী এবং মুখ্যত তাঁরা উভয়েই সাহিত্যিক হলেও সাহিত্য তাঁদের কাছে জীবনেরই একটি দিক হিসেবে দেখা দিয়েছিল, জীবনের চাইতে বড় বলে স্বীকৃত হয়নি।

তা ছাড়া যে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথ দেখা দিয়েছিলেন সেখানেও তাঁদের মধ্যে আশ্চর্য মিল চোখে পড়ে। গ্যয়টের জন্ম সতেরোশ' উনপঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে। জার্মানীর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন তখনও গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। তাঁর বয়ঃপ্রাপ্তির যুগে জার্মানীর সাংস্কৃতিক জীবনে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস্ আন্দোলনের কিছু কিছু প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। কাণ্টের যুক্তিবাদী দর্শন, হ্বিঙ্কেল্‌মানের শিল্পতত্ত্ব, লেসিঙ্-এর সাহিত্য বিচার এবং হের্ডর-এর ইতিহাস তত্ত্বের মারফৎ প্রাচীন গ্রীস এবং আধুনিক ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি জার্মান মানসে প্রবেশ লাভ করে। রিফর্মেশ্যন্ জার্মানীকে রেনেসাঁসের মহৎ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।[1] এঁদের প্রয়াসে

---

(১) অনেকের ধারণা রিফর্মেশ্যন রেনেসাঁসেরই একটা দিক। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রোটেস্ট্যাণ্ট হওয়ার ফলে তাঁদের ইতিহাস ব্যাখ্যায় রিফর্মেশ্যনের প্রতিক্রিয়াশীল দিকটি খুলে দেখানো হয়নি। এবং যেহেতু আমরা ইংরেজের লেখা ইতিহাস পড়েই ইউরোপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছি, সেকারণে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের ধারণা রেনেসাঁস আর

আঠার শতকে জার্মানীতে সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এঁদের কর্ষিত জমিতে ফসল ফলালেন গ্যয়টে। তিরাশি বছর-ব্যাপী দীর্ঘজীবনের প্রচেষ্টায় জার্মানীকে তিনি রেনেসাঁসের উত্তরসাধকদের মধ্যে প্রধান করে তুললেন। তাঁর পূর্বে জার্মানীতে সাহিত্য বলতে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না; যেমন দরিদ্র ছিল জার্মান ভাষা তেমনি অপুষ্ট ছিল জার্মান মানস। গ্যয়টে জার্মান সাহিত্যকে প্রাদেশিকতার স্তর থেকে বিশ্বসাহিত্যের স্তরে পৌঁছে দিলেন; দেখা গেল প্রকাশ ক্ষমতায় জার্মান ভাষা অন্যান্য প্রধান ইয়োরোপীয় ভাষার চাইতে খুব খাটো নয়। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে জার্মান মন ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ এবং পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। রেনেসাঁসের

রিফর্মেশনের মধ্যে বিশেষ কোন ফারাক নেই। আসলে কিন্তু রেনেসাঁস এবং রিফর্মেশনের মধ্যে মিলের চাইতে বিরোধ অনেক বেশী। রিফর্মেশনের অভাবাত্মক দিকটি বিষয়ে যাঁরা জানতে চান তাঁদের বিশেষ করে ফ্রোম্ সাহেবের "দি ফিয়ার অব্ ফ্রিডম্" (পৃঃ ৫৩-৮৮) এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের "রীজন্, রোমান্টিসিজম্ অ্যাণ্ড রেভোলিউশন", প্রথম খণ্ড (পৃঃ ১০৩-১৩১) পড়তে অনুরোধ করি। গ্যয়টে অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন প্রোটেস্ট্যান্টিজম্ জার্মানীর কতখানি ক্ষতি করছে। তাঁর এই চরণ দুটি খুব বিখ্যাত :

Franztum drangt in diesen verworrenen Tagen,
wie einstmals
Luthertum ist getan, ruh'ge Bildung Zuruck.

"শান্ত সংস্কৃতি পূর্বে যেমন লুথারের দ্বারা পীড়িত হয়েছিল, আমাদের এই ক্ষুব্ধ যুগে তেমনি ফ্রান্সের দ্বারা তাড়িত হয়ে পিছু হটাছে।" (ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে গ্যয়টের অভিযোগ বিষয়ে আলোচনা এ প্রবন্ধের শেষ দিকে করেছি।) এই কারণেই তিনি হ্বিঙ্কেল্‌মানের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম ত্যাগ করে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করার মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পাননি। বরং তিনি বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে হ্বিঙ্কেল্‌মান্ আসলে প্রোটেস্ট্যান্টও নন, ক্যাথলিকও নন, তিনি একান্ত ভাবেই প্রকৃতি পন্থী। "হ্বিঙ্কেল্‌মানের জীবনী" পড়ে শ্লেগেল তাই বলেছিলেন, এ বই যে লিখেছে সে ঈশ্বরদ্রোহী।

মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য তখন ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ক্ষীণ হয়ে আসছিল গ্যয়টে তাতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করলেন। শুধু জার্মানীর উজ্জীবন ঘটালেন না, নিয়ে এলেন ইয়োরোপের পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি।

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক পটভূমি এদিক থেকে গ্যয়টের পটভূমির সঙ্গে অনেকটা এক। গ্যয়টে মারা যান আঠারশ বত্রিশ সালে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম তা থেকে প্রায় তিরিশ বছর পরে, আঠারশ একষট্টিতে। রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে ভারতবর্ষের দশা প্রায় একশ বছর আগে গ্যয়টের জন্মকালে জার্মানীরই সমান। এদেশের স্থবির সমাজ এবং জীবনবিমুখ সংস্কৃতির ওপরে পশ্চিমী রেনেসাঁসের ধাক্কা সবে তখন ঢেউ তুলেছে। কাণ্ট, হ্বিঙ্কেল্‌মান, লেসিঙ্‌ এবং হের্ডর যেমন ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রাচীন গ্রীস ও রোম এবং আধুনিক ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের চিন্তাকে জার্মানীতে স্বাগত করেছিলেন, এদেশে তেমনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল (এবং গোড়ার দিকে বঙ্কিম) প্রমুখ সংস্কারক এবং সাহিত্যিকেরা ইয়োরোপের নবাগত সংস্কৃতির ধারাকে এদেশের ভূমিতে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষের বহুবিলম্বিত রেনেসাঁস আন্দোলনের উপক্রমণ কাল হিসেবে উনিশ শতকের প্রথম ষাট বছর তাই বিশেষ স্মরণীয়। কিন্তু এঁরাও শুধু ভূমিকাই রচনা করতে পেরেছিলেন; তার বেশী এগোতে পারেন নি। এই ভূমিকার নির্দেশ অনুসরণ করে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাবার দায়িত্ব নিয়ে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দিকে এ দায়িত্ব তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে এদেশে রেনেসাঁস-বিরোধী যে আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে (বাংলা দেশে সে আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন প্রথমে বিবেকানন্দ এবং পরে অরবিন্দ), রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পর্যন্ত তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। বিশ শতকের প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত তাই তাঁর রচনায় এবং কাজকর্মে রক্ষণশীল জাত্যভিমান এবং অভ্যাসাশ্রয়ী

ধর্মসংস্কারের মনোভাব চোখে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন এই আত্মঘাতী সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আশ্রয় পায়নি। যতই তাঁর বয়স বেড়েছে ততই তাঁর চিন্তায় এবং ব্যবহারে উনিশ শতকের অসমাপ্ত রেনেসাঁসের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ফলত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন অনুধাবন করলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, পুরোপুরি না হলেও মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ গ্যয়টের মতই রেনেসাঁসের উত্তরসাধক এবং আধুনিক ভারতের, বিশেষ করে আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে তাঁর একক দান বাকী সকলের সমবেত দানের চাইতে বেশী। গ্যয়টের মত রবীন্দ্রনাথও আমাদের শিক্ষিত সমাজকে সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিকতার সংস্কার থেকে মুক্ত করে বৈশ্বিকতার বোধে উদ্বুদ্ধ করলেন; মাতৃভাষার অপুষ্টতা এবং আড়ষ্টতা দূর করে তাকে মহৎ প্রকাশের মাধ্যমে রূপান্তরিত করলেন। গ্যয়টের মত রবীন্দ্রনাথও তাই তাঁর আপন মাতৃভাষা এবং সংস্কৃতির জনক না হলেও মুখ্য ভর্তা।

তিন

যেহেতু গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আপন আপন দেশে রেনেসাঁসি ঐতিহ্যের প্রধান উত্তরসাধক, সে কারণে তাঁদের উভয়ের মানসিক গঠনেও যে বহু মিল থাকবে এটা সহজেই অনুমান করা যায়। উভয়েই যুক্তিবাদী, ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ মূল্যে বিশ্বাসী এবং বিশ্বমানবতার অকুণ্ঠ সমর্থক। গ্যয়টের যুক্তিবাদ তাঁকে মুগ্ধ রোমান্টিক একদেশদর্শিতার প্রভাব থেকে মুক্ত করেছিল। "গ্যয়ট্‌স্‌ ফন্‌ বের্‌লিখিঙ্গেন" অথবা "হ্বের্‌টরের দুঃখ" কাহিনী লিখে তিনি ফুরিয়ে যান নি; "হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মেইস্টার", "ইফিগেনী" এবং "ফাউস্ট"-এ ক্লাসিক ও রোমান্টিকের সার্থক সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিলেন; রুসোর কাছে দীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও দিদেরোর শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনে তাঁর কিছু মাত্র অসুবিধা হয়নি। রবীন্দ্র-

নাথের ক্ষেত্রেও যুক্তিবাদ একধারে তাঁকে বৈষ্ণব ভাবালুতার হাত থেকে রক্ষা করেছে, অন্যদিকে এরই জোরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে জয় করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ তাই পানু বাবুর চরিত্র আঁকতে কুণ্ঠা বোধ করেননি; ধার্মিক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'চতুরঙ্গে'র নাস্তিক জ্যাঠামশাইকে শ্রদ্ধা জানানো সহজ হয়েছিল; এমন কি গান্ধীকে মহাত্মা বলে ঘোষণা করার পরেও তিনি 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তাঁর যুক্তিবিরোধী মনোভাবের তীক্ষ্ণ সুচিন্তিত প্রতিবাদ করতে পেরেছিলেন।[২] তিনি নিশ্চিত করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, "ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত কর্ষণ করে বিচিত্র এবং বিস্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়" (সমাধান)। এরাজ্‌মুস্‌-শিষ্য গ্যয়টে ধর্মান্ধতার মূঢ়তা থেকে মুক্ত

(২) শুধু "সত্যের আহ্বান"-এ নয়, আরও অনেক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর কঠোর সমালোচনা করেছেন। অথচ গান্ধীকে তিনি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন; তাঁর সততা, আত্মপ্রত্যয়, মানবপ্রেম, নিষ্ঠা এসব দুর্লভগুণের জন্য তাঁকে তিনি বারবার শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু যেখানে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতে মেলেনি, সেখানে সে অমিলের কথা তিনি সোজাসুজি স্বীকার করেছেন। খিলাফৎ, চরকা, স্বরাজ, অসহযোগ, পশ্চিম-বিমুখ মনোভাব, আত্মনিগ্রহ, জাতীয়তাবাদ, ঐশী নির্দেশ ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেই তিনি গান্ধীজির বিরোধিতা করেছেন। প্রতিক্ষেত্রেই কবি যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গান্ধীর সমালোচনা করেছেন সেটি স্পষ্টতই মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী। কৌতূহলী পাঠক এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ লেখাগুলি পড়ে দেখতে পারেন: ১৯২০-২১ সালে বিদেশ থেকে এণ্ড্রুজ্‌ সাহেবকে লেখা পত্রাবলী; বরদৌলী সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে লাল দলপত রামকে লেখা খোলা চিঠি; "শিক্ষার মিলন", "সত্যের আহ্বান", "সমস্যা", "সমাধান", "চরকা" "স্বরাজ সাধন"; ১৯৩০ সালে বিলেতে স্পেক্‌টেটর পত্রিকায় (১৫ নভেম্বর) গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব সম্বন্ধে চিঠি; ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের পরে গান্ধীজির বক্তব্যের প্রতিবাদ করে চিঠি। চিঠিগুলি ছাড়া বাকী প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ডে "কালান্তর" এবং তার "সংযোজনে" মিলবে।

হবার জন্য জার্মানীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। রামমোহনের শিষ্য রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের হিন্দুদের স্মরণ করতে বললেন, "আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করেছি এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন কবে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে।" (পত্র, ২০শে আষাঢ়, ১৩১৭)। তাঁর সত্য ভাষণ তাই বারবার এদেশের জড়বুদ্ধিকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে। বুদ্ধির এই জড়তাকে তিনি আঘাত করেছেন 'অচলায়তনে', 'তাসের দেশে', শিক্ষা, ধর্ম এবং রাজনীতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে। বারবার তিনি আমাদের স্মরণ করিয়েছেন যে, "অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিযে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভালো করে বুঝতেই পারবে না, বহন করা তো দূরের কথা" (সমাধান)। তাঁব একেবারে শেষের দিকের লেখা 'ল্যাবোরেটরী' গল্পটি দুঃসাহসী মুক্তবুদ্ধির এক আশ্চর্য উদাহরণ। এই যুক্তিশীলতার জোরেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, 'মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা...কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরমপদ অধিকার করিতে চায় তখন তাহার মত মননে বাধা আর কি হইতে পারে! কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না—তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে। তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়া রচিত, তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫০৬-৭)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রের পক্ষে সেদিন একথা বলা বড় সহজ ছিল না।

এই যুক্তিশীলতার সামর্থ্যে বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ এবং অরবিন্দের যুগে জন্মেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁদের প্রভাব অতিক্রম করে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরে পৌঁছন সম্ভব হয়েছিল।[৩] তাই ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পের পর গান্ধীজী যখন ঘোষণা করলেন যে এ বিপর্যয় নাকি অস্পৃশ্যতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ভগবানের ইচ্ছায় ঘটেছে তখন অন্যেরা চুপ করে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ সেই যুক্তিহীন ঘোষণার প্রবল প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেননি। অন্যধারে এই সত্যনিষ্ঠা তাঁকে "আনন্দ মঠের" চোবাবালি থেকে রক্ষা করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মত বুদ্ধিমান লোকও যখন "যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই তো মা সেই ধন্য দেশ!" জাতীয় দেশাভিমানের বুলি দিয়ে সস্তায় বাজী মাতের চেষ্টা করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক চরিত্র আঁকতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করেন নি। ফলে গ্যয়টের মত তাঁকেও আপন দেশবাসীর কাছে বিস্তর ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে। তিনি যে স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসেবে আবেদন

---

(৩) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ একই সময়ের মানুষ হয়েও পরস্পরকে আগাগোড়া এড়িয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১তে; বিবেকানন্দের ১৮৬৩। প্রথম যৌবনে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেছেন। বিবেকানন্দ যখন মারা যান (১৯০২) রবীন্দ্রনাথ তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তাঁর "চোখের বালি" উপন্যাস তখন প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ বিবেকানন্দের লেখায় রবীন্দ্রনাথের কোনো উল্লেখ নেই; বিবেকানন্দের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর সম্বন্ধে যে সামান্য উল্লেখ আছে তাতে ব্যঙ্গের ভাব খুব প্রচ্ছন্ন নয়। ('বঙ্গদর্শন, "সমাজভেদ", ১৩০৮, আষাঢ়।) পরবর্তীকালেও কবি তাঁর লেখায় রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দকে বিশেষ আমল দেননি। অথচ রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর মত শ্রদ্ধাশীল এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রচনা আজ পর্যন্ত আর কেউ লেখেননি।

প্রসঙ্গত শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়-এর "রবীন্দ্র জীবনী" ২য় খণ্ড, পৃঃ ১-৯ দ্রষ্টব্য।

নিবেদন কিংবা জোরজবরদস্তির চাইতে বিচারবিশ্লেষণ এবং শিক্ষা বিস্তারকে শ্রেয় জেনেছিলেন, দেশের উন্নতির জন্য বিদেশী বর্জনের পন্থায় ভরসা না রেখে সমবায়-ভিত্তিক সংগঠনের আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন—এ সবের মধ্যেই তাঁর সুদূরপ্রসারী যুক্তিশীলতার প্রত্যক্ষ পরিচয় চোখে পড়ে।

চার

পশ্চিমী রেনেসাঁসের ইতিহাস যাঁরাই পাঠ করেছেন, তাঁরাই জানেন রেনেসাঁসী দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ মূল্য বিষয়ে বোধ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। ব্যক্তিমাত্রই অনন্য ঃ প্রতি ব্যক্তির মধ্যে যে মুক্তিস্পৃহা বর্তমান, তার স্ফুরণ ছাড়া সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব ঃ ব্যক্তির বিকাশ সর্ববিধ কল্যাণের মূল উৎস। গ্যয়টের প্রথম বয়সের খণ্ড রচনা "মাহমেট-এর গান" এবং 'প্রমেথেয়ুস' থেকে শুরু করে শেষ বয়সের রচনা 'ফাউস্টের' দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যক্তিসত্তার মুক্তিতৃষ্ণা প্রবল প্রাচুর্যে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যধারে হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মেইস্টার-এর মহাকাহিনীতে গ্যয়টে সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়েছেন, প্রতি মানুষই বিচিত্র সম্ভাবনার আকর এবং চরিত্র মাত্রই, প্রধান হোক বা অপ্রধান হোক, আপন প্রাতিস্বিকতায় অনন্য। "একরমানের সঙ্গে আলাপে" তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "আমি চিরদিন প্রত্যেক মানুষকে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে জ্ঞান করেছি, বুঝতে চেয়েছি কোথায় তার স্বকীয়তা, সামান্যের মধ্যে তাকে মিশিয়ে দিতে চাইনি।" অন্যত্র লিখেছেন, "এই জগৎ এমন আশ্চর্যভাবে তৈরি যে প্রত্যেকটি মানুষ তার আপন স্থান-কালে অন্যসব মানুষের চাইতে বড়।" কান্টের মত গ্যয়টেও জানতেন প্রতি মানুষ নিজেই একটি চরম উদ্দেশ্য—তাকে অন্য কোন উদ্দেশ্যের উপায় হিসাবে ভাবলে তার চাইতে মারাত্মক ভুল আর কিছু

হতে পারে না। গ্যয়টে তাই ঈশ্বর, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, সব কিছুর ওপরে প্রধান করে ধরেছেন মানুষকে, ব্যক্তি মানুষকে, যে ব্যক্তি মানুষ সমাপ্তিহীন বিকাশের অভীপ্সায় নিত্য সক্রিয়। "হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মেইস্টারের ভ্রমণ"-এ গ্যয়টে যাকে "দার্শনিকের ধর্ম" বলেছেন, তার মূল কথা হ'ল সব মানুষকে আপন মূল্যে মূল্যবান বলে ভাবতে শেখা। এই দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতেই গ্যয়টে পেরেছিলেন কাণ্টের সঙ্গে দিদেরোকে মেলাতে, পেরেছিলেন একই সঙ্গে লিখতে "হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মেইস্টারের শিক্ষানবিশী" এবং "হেরমান ডোরোতেয়ার" কাব্য-কাহিনী।

ব্যক্তির স্বকীয় মূল্য বিষয়ে বোধ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনেরও অন্যতম মুখ্য সূত্র। তাঁর কাব্যে এটি সব সময়ে তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনায়, বিশেষ করে তাঁর বহু ছোট গল্পে এই বোধ যেমন গভীর, তেমনই প্রত্যক্ষ। আমার ধারণা, অন্য বৈশিষ্ট্য যদি নাও থাকত, শুধু এই গুণেই ছোট গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও অমর হ'য়ে থাকবেন। কোন মানুষই যে সামান্য নয়, প্রতি মানুষের মধ্যেই যে অক্ষয় সম্পদের সম্ভাবনা নিহিত আছে এবং সেই সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতন হওয়ার দ্বারাই মানুষ আপনাকে সমৃদ্ধ করে তোলে—মানবতন্ত্রের এই মূল প্রত্যয়টিকে রবীন্দ্রনাথ গ্যয়টের মতই নানাভাবে, নানারূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ করে 'পরিশেষ' এবং 'পুনশ্চ' এই সুরটি প্রত্যক্ষভাবে প্রধান। 'বাঁশি' কবিতায় লিখেছেন,

হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।

এই জ্ঞান থেকেই সাহিত্যের জন্ম, জন্ম মানবতার। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচনা "পঞ্চভূতের ডায়েরী"র এক জায়গায় একটি ঠিকা মুহুরী যুবকের করুণ কাহিনী প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "ভীষ্ম,

দ্রোণ ভীমার্জ্জুন খুব মহৎ; তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোন কবি অনুমান করে নাই, কোন পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না—একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু খোরাক পোষাক সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারো মাস নহে।" গ্যয়টে তাঁর 'হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মেইস্টারের ভ্রমণ কাহিনী"তে লিখেছিলেন, "দার্শনিক সব মানুষকেই নিজের সমান বলে ভাবতে পারেন, কোন মানুষকে তিনি তুচ্ছ মনে করেন না। জগতের প্রতি ব্যক্তিকেই তিনি অনন্য বলে স্বীকার করেন, তাই তিনি সত্যাগ্রহী।" রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক রচনায় মানবধর্মের এই দিকটি সব সময় অতটা স্পষ্ট স্বীকার লাভ করেনি—ব্যক্তির প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের চাইতে মানবীয় ঐক্যের ওপরে তিনি বেশী জোর দিয়েছেন—কিন্তু তাঁর গল্প কাহিনীতে এ বোধ যেমন গভীর তেমন স্পষ্ট। রতন, রামকানাই, রাইচরণ, কাবুলীওয়ালা, চন্দরা, 'দিদি' গল্পের শশী, 'মাস্টার মশাই' গল্পের হরলাল—প্রতিটি চরিত্রই আপাতদৃষ্টিতে সামান্য ব্যক্তির মধ্যে যে অসামান্যতা নিহিত থাকে, তারই উদাহরণ। 'সবুজ পত্রের' যুগের গল্পগুলিতে এই বোধ আরও প্রবল, আরও পরিস্ফুট। ধর্ম, সমাজ, পরিবার, প্রথা ইত্যাদির নির্বিবেক দাবির সামনে এদেশে যেভাবে ব্যক্তিকে সাড়ম্বরে বলি দেওয়া হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ এই যুগের গল্প কাহিনীগুলিতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বলিদান যে কত নিরর্থক, বেদানাকরুণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বারবার তা উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বাংলা দেশে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরে যে বোধের স্ফুরণ ঘটেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা যার দ্বারা কিছু পরিমাণে বিচলিত হলেও যাকে যথার্থভাবে গ্রহণ এবং পোষণ করতে পারেনি, রবীন্দ্রনাথের এ যুগের গল্প কাহিনীতে তা সম্যক পুষ্টি এবং পরিণত প্রকাশ লাভ করেছে। 'হালদারগোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদি এই যুগের রচনা। 'স্ত্রীর পত্রে'র মেজ বউ বিয়ের পনের

বছর পরে তার স্বামীকে চিঠি লিখেছিল, "আমি তোমাদের মেজবউ। আজ পনের বছর পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে...আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাই-পাঁশ যাই হোক না কেন সেখানে তোমাদের অন্দর মহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি, আমি। ...তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে...বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই।...এইবার মরেছে মেজবউ...আমি বাঁচলুম।" এ সেই বাঁচা যে বাঁচার আহ্বান গ্যয়টে তাঁর সমস্ত রচনায় ধ্বনিত করেছিলেন। এরই ডাকে ইব্‌সেনের নায়িকা তার পুতুল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। মানুষ যে সমাজ পরিবারের ছাপমারা জীব মাত্র নয়, সে যে ব্যক্তি, সে যে বিশেষ, তার মধ্যে যে অসামান্যতা লুকিয়ে আছে, মহৎ সাহিত্য পাঠের ফলে এই ভুলে-যাওয়া সত্যকে আমরা ফিরে ফিরে আবিষ্কার করি। সাহিত্যিক "শ্যামলী"র সেই 'বাঁশিওয়ালা' যার ডাক শুনে

একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।

পাঁচ

যুক্তিকে যাঁরা জীবনের কেন্দ্রে স্থাপিত করেছেন, ব্যক্তির মূল্য যাঁদের বিবেকে স্বতঃসিদ্ধ, তাঁদের পক্ষে কোন ক্ষুদ্রতার গণ্ডির মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথ তাই আপন সমাজের উজ্জীবনে প্রধান অংশ নিয়েও আপন জাতিকে মানব জাতির

চাইতে বড়ো বলে ভাবতে পারেননি। জাতীয়তার সঙ্গে বিশ্বমানবতার বিরোধ যে কত গভীর, গোড়ার দিকে এঁদের দুজনের কারো কাছেই সেটা খুব স্পষ্ট ছিল না। গ্যয়টের জীবনে সে বোধ রবীন্দ্রনাথের চাইতে কিছু আগে এসেছিল। ফরাসীর কাছে জার্মানীর পরাজয়কে তাই তিনি স্বাগত করতে পেরেছিলেন। গভীর সত্যাশ্রয়িতার জোরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফরাসীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নয়, ফরাসীর কাছ থেকে গ্রহণ করে তবেই জার্মানী যথার্থ বড়ো হয়ে উঠতে পারবে। একথা বলার জন্য সেদিন দেশবাসীর হাতে তাঁকে প্রচুর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য তিনি তাঁর নিজের গভীরতম প্রত্যয়কে গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। তিনি লিখেছিলেন, "মুক্তিই মানুষের মূল সাধনা এবং সে সাধনার সামনে জাতিতে জাতিতে ভেদের সীমারেখা লোপ পেতে বাধ্য। এই সাধনার পথে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার শিল্প এবং সাহিত্য, তার বিজ্ঞান এবং নীতিবোধ। এর কোনটিই জাতীয় ভেদবুদ্ধির দ্বারা চিহ্নিত নয়; এদের মধ্যে পৃথিবীর সব যুগের সব মানুষের মন এসে মিলিত হয়েছে।" অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "বিজাতি-বিদ্বেষের উদ্ভব সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি থেকে। মন যেখানে অপরিণত, এ মনোভাব সেখানে খুব প্রবল। · মনের যত বিকাশ ঘটে, এ মনোভাব ততই দুর্বল হয়ে আসে। আমরা বুঝতে শিখি আমরা এবং আমাদের প্রতিবেশীরা একই মানবজাতির অন্তর্গত; শিখি তাদের দুঃখদুর্দশাকে আমাদের দুঃখদুর্দশা বলে ভাবতে।" গ্যয়টে অবশ্যই জার্মানীকে ভালবাসতেন, কিন্তু দান্তের মত তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত পৃথিবীই তাঁর স্বদেশ। জার্মানীর চিৎ-প্রকর্ষের জন্য ইংরেজ, ফরাসী, ইতালীয়, গ্রীক কারো কাছ থেকে সম্পদ সংগ্রহ করায় তাঁর সঙ্কোচ হয়নি। "একরমানের সঙ্গে আলাপ"-এ তিনি বলেছেন, "কবির মন কোনো ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাঁধা থাকতে পারে না; যেখানে তার কাব্যের উপাদান মিলবে, সেখানে তার দেশ। ঈগল

পাখীর মত আকাশ থেকে সে পৃথিবীকে দেখছে—শিকার পাওয়া নিয়ে তার ভাবনা, সে শিকার প্রুশিয়ায় মিলল না সাক্‌সনিতে তাতে কি আসে যায়।”

জাতীয়তার মোহ থেকে মুক্ত হতে গ্যয়টের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কিছু বেশী সময় লেগেছিল, কিন্তু মুক্ত যে তিনি হয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর ‘গোরা’ উপন্যাস, ‘কালান্তরের’ প্রবন্ধাবলী, ‘ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌’ ‘মানুষের ধর্ম’ ইত্যাদি বক্তৃতা, বিদেশ থেকে এণ্ড্রুজ সাহেবকে লেখা চিঠিপত্র এবং বিশেষ করে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান। এই শতাব্দীর সূচনায় বাঙলাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যখন সূত্রপাত ঘটে, রবীন্দ্রনাথও তাতে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে বিবেকানন্দের প্রভাবে সে জাতীয়তাবোধের মধ্যে হিন্দুত্বেব ভাবটা বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল; তাবপর এ শতকের গোড়ায় কাকুজো ওকাকুরা, কুমাবস্বামী, নিবেদিতা ইত্যাদির প্রভাবে এশিয়ার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে ধাবণা এই আন্দোলনকে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতাব প্রতি বিমুখ কবে তোলে। রবীন্দ্রনাথও এ যুগে হিন্দু জাতীয়তাব সমর্থনে বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। (দ্রষ্টব্য, ১৩০৮ সালের বঙ্গদর্শনে ‘নকলেব নাকাল’, ‘হিন্দুত্ব’ ইত্যাদি প্রবন্ধ)। ‘নৈবেদ্য’র কবিতাগুলিও মূলত এই সুরে বাঁধা; তাঁব অধিকাংশ স্বদেশী গান এই যুগের রচনা। ত্রিপুবার মহাবাজকুমারকে ১৩০৮ সালের একটি চিঠিতে লিখেছেন: “বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ।” কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ মনোভাব তাঁকে বেশীদিন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে নি। এমন কি ‘নৈবেদ্য’র (১৩০৮) মধ্যেই তিনি জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ রূপটির কথা উল্লেখ করেছেন।

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে। (নৈবেদ্য, ৬৫)

অথবা

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়। (ঐ, ৬৪)

তবে এ যুগে যে-জাতিপ্রেমকে তিনি আক্রমণ করেছেন, সেটি মুখ্যত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রদের জাতিপ্রেম যার বীভৎস প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদে, বুয়র যুদ্ধে, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দুর্বল দেশের ওপরে পশ্চিমের নির্বিবেক অত্যাচারের মধ্যে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর এদেশে স্বাজাত্য-বোধের যে আত্মঘাতী রূপ ক্রমে প্রকট হয়ে উঠতে লাগল, তা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের মত যুক্তিশীল এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে হিন্দুয়ানী ঘেঁসা জাত্যভিমানকে আঁকড়ে থাকা বেশীদিন সম্ভব হ'ল না। ১৩১৪-১৫ সালে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তনের সূচনা চোখে পড়ে। ঐ সময়ে লেখা 'ব্যাধি ও প্রতিকার,' 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা,' 'পূর্ব ও পশ্চিম' ইত্যাদি প্রবন্ধের মধ্যে যে নূতন প্রত্যয় ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার একদিকে আছে ব্যক্তি মানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যধারে সর্বমানবীয় ঐক্যে আস্থা। 'ব্যাধি ও প্রতিকার'-এ তিনি লিখেছেন, "...যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে।" অন্যধারে ১৩১৯ সালে "সংগীত" প্রবন্ধে লিখেছেন, "য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া বড়ো করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিব।" "আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাইতেছে, তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে।" 'গোরা' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৩১৪-১৬ সালে। বিবেকানন্দ-অরবিন্দ প্রবর্তিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের সুগভীর ব্যর্থতা এই বিরাট উপন্যাসটির মূল ভাবসূত্র। 'গোরা'র পর থেকে ক্রমেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়

বিশ্বমানবতাবোধ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই বোধের বলিষ্ঠতম প্রকাশ জাপান এবং আমেরিকায় ১৯১৬ সালে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী। এই বক্তৃতাগুলি পরে ১৯১৭ সালে "ন্যাশন্যালিজ্‌ম্" এবং "পার্সোন্যালিটি" নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন লেখার সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় নাও থাকত, শুধু এই দুটি বইয়ের জোরেই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারতাম যে, বিশ্বমানবিকতার ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ গ্যয়টের মহৎ উত্তরসাধক।

"ন্যাশন্যালিজ্‌ম্" প্রবন্ধমালায় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই দেখালেন যে, জাতীয়তা একধারে মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার মনুষ্যত্বকে গণ্ডিবদ্ধ করে, অন্যধারে এক কাল্পনিক সমষ্টির হাতে ব্যক্তিকে বলি দিয়ে মানুষের সমস্ত সৃষ্টিশীল বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। 'নেশ্যন' যে ব্যক্তিকে শুধু যন্ত্রে পরিণত করে তাই নয়, তার ভিত্তি ক্ষমতা এবং আতঙ্কের ওপরে। রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন, মানবতার খাতিরে আমাদের সোজা দাঁড়িয়ে সকলকে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে যে, জাতীয়তা এক নিষ্ঠুর মহামারী, যে এই পাপ ব্যাধি আজ মানবজগতে ছড়িয়ে পড়ে তার নৈতিক প্রাণশক্তিকে জীর্ণ করে ফেলছে। ("...for the sake of humanity, we must stand up and give warning to all that Nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality.")

জাতীয়তা যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, তবে কোন্ বিকল্প প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষের সমাজ গড়ে উঠবে? এখানেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই গ্যয়টের অনুগামী। সভ্যতার প্রথম ভিত্তি, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করা। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, জাতির হাত থেকে মুক্তি পাবার পর মানুষের নবজন্ম ঘটবে—বিমূর্ত কল্পনার অস্পষ্ট আবরণ থেকে আপন

ব্যক্তিসত্তায় মানুষ মুক্তি পাবে। ("...man will have his new birth, in the freedom of his individuality, from the enveloping vagueness of abstraction.") "পার্সোন্যালিটি" বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথ নানা দিক থেকে এই ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করার সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ঐক্য তাকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই ঐক্য সাধিত হবে বুদ্ধি এবং প্রেম, শিল্প এবং বিজ্ঞান, দর্শন এবং শিক্ষার মধ্য দিয়ে। ১৯২০ সালে ২৫শে নবেম্বর এণ্ড্রুজ সাহেবকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আমাদের জায়গা করতে হবে মানুষের জন্যে, যে মানুষ এ যুগের অতিথি; জাতি যেন তার পথ আটকে না দাঁড়ায়। ("We must make room for MAN, the guest of this age, and let not the NATION of this age obstruct his path.") আর একটি চিঠিতে লিখছেন, "জাতিপ্রেমের অহঙ্কার তার বিপুলতাকে নিয়ে। যে প্রভেদ মৌলিক তাকেও সে মানতে চায় না।...ক্ষমতার নির্ভর সংখ্যা এবং আয়তন।...সে ঐক্যের কথা বলে কিন্তু ভুলে যায় যে মুক্তির মধ্যেই যথার্থ ঐক্য। সকলকে এক ছাঁচে ফেলে যে ঐক্য সে ঐক্য বন্ধনের। ("...patriotism is proud of its bulk. It would not acknowledge a difference which was fundamental...power lies in number and in extension....It talks of unity but forgets that true unity is that of freedom. Uniformity is unity in bondage.)[৪] গ্যয়টের মত রবীন্দ্রনাথও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, মানুষের ঐক্য মানুষের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে তার মধ্যে সঙ্গতি

(৪) এখানে সব কটি ইংরেজী উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা থেকে নেওয়া; দুঃসাহসে ভর ক'রে সেগুলির যতদূর সম্ভব মূলানুগ বাংলা তর্জমা করার চেষ্টা করেছি।

ঘটিয়ে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা তাই জাতীয় সমষ্টিবাদের বৃহত্তর সংস্করণ নয়, তার ভিত্তি স্বাধীনতা এবং সহযোগ। এই তত্ত্ব তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন তাঁর ১৯২০-২১ সালে ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে ; পরে এগুলি Creative Unity নামে প্রকাশিত হয়। এই সৃষ্টিধর্মী ঐক্যের ভিত্তিতেই তিনি বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করেন।[৫]

ফলত রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যয়টে উভয়েই আপন দেশ এবং দেশের মানুষকে ভালবেসে সে দেশকে "ভৌগোলিক পৌত্তলিকতার" উর্ধ্বে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। "আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই।" (সবুজপত্র, ভাদ্র, ১৩২৮)। তাঁদের আপন আপন দেশবাসী কিন্তু তাঁদের এই মুক্তবুদ্ধিকে স্বাগত করতে পারে নি।

---

(৫) "মানুষের সঙ্গে মানুষে যে একত্র হয়েছে এই মহৎ ঘটনাকে আমরা আজও সত্য বলে অনুভব করতে পারছি নে। তাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় সেই প্রাচীন অভ্যাসটাকে মনের মধ্যে পাকা ক'রে তোলবার চেষ্টা এখনও চলেছে, তাই স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় ক'রে তোলাকেই আমরা কর্তব্য বলে স্থির করেছি। এমন অবস্থায় কোনো এক জায়গায় আজ সেই বাণী-ঘোষণার কেন্দ্র থাকা চাই, যে-বাণী অতীত কালের বাণী নয়, যে-বাণী ভবিষ্যতের বিরাট মুক্তিক্ষেত্রের বাণী।" বিশ্বভারতী উদ্বোধনের আগের দিন পৌষ উৎসবের ভাষণ।

"কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে, মনে করে, তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না।...আমরা কি এ কথাই বলব যে মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই। তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড়ো গৌরব? এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও এ'কে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।" বিশ্বভারতীর উদ্বোধন ভাষণ।—প্রভাত মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯০-৯১।

গ্যয়টেকে সারাজীবন এজন্য আক্রমণ সইতে হয়েছে ; তবু তিনি নির্ভয়ে ঘোষণা করেছিলেন, "জাতীয়তা এবং সভ্যতা পরস্পরের আমরণ শত্রু।" দেশবাসীর দৃষ্টিকে স্বাজাত্যের উর্ধ্বে তোলার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকেও কম বিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। প্রথম যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, এমনকি সাময়িকভাবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল ; মধ্য যুগে চিত্তরঞ্জন দাশ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র এবং মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর মৃত্যুর পরে বাঙলা দেশের কমিউনিস্টরা পর্যন্ত তাঁর বিশ্বমানবতাকে নানাভাবে সমালোচনা করেছেন। সমসাময়িক জার্মানী গ্যয়টেকে যথেষ্ট সমীহ করত, কিন্তু তার মন কেড়েছিলেন আবেগবিলাসী দেশপ্রেমী কবি শিলাব। বাঙলা দেশও রবীন্দ্রনাথকে বিস্তর সম্মান দেখিয়েছে, কিছু সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী ছেলেমেয়ের ভালবাসা যিনি পেয়েছিলেন তিনি "গোরা" কি "চার অধ্যায়"-এর লেখক নন, তিনি "পথের দাবী"র লেখক শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের এই সাফল্যের কারণ বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধের পাশে শরৎচন্দ্রের "শিক্ষার বিরোধ" প্রবন্ধটি পড়া দরকার। গ্যয়টের মত রবীন্দ্রনাথও জানতেন যে তাঁর দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর-চিন্তাকে গ্রহণ করে নি এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্যয়টের মত একথাও তিনি বুঝেছিলেন, "আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে।" এ জাত শিল্পীর, সত্যসন্ধের, মুক্তিসাধকের, মানবতন্ত্রীর জাত। এই জাতের কথা মনে রেখেই রলাঁ তাঁর বিখ্যাত ঘোষণাপত্র লিখেছিলেন, "আমরা শুধু সত্যকেই সেবা করি, যে সত্য স্বাধীন, যার কোন ভৌগোলিক সীমা নেই, কোন গণ্ডি নেই, কোন জাতিবর্ণের সংস্কার নেই।" এ ঘোষণাপত্র গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথেরও ঘোষণাপত্র।

ছয়

অর্থাৎ শুধু যে প্রতিভার বহুমুখিনতায় অথবা ঐতিহাসিক পটভূমির দিক থেকে গ্যয়টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল আছে তাই নয়, রেনেসাঁসের উত্তরসাধক হিসেবে তাঁরা মানবতন্ত্রী সাধনার ক্ষেত্রেও মিলিত হয়েছিলেন। সত্যসন্ধিৎসা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিশ্বমানবতার প্রত্যয়ে তাঁদের সমধর্মিতার কথা আগেই বলেছি; তাছাড়া মানবতন্ত্রী দর্শনের আরো কোনো কোনো মূল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও তাঁদের মিলন ঘটেছিল। তাঁরা উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে মানুষের মধ্যে যা যুক্তি-শীলতারূপে বিদ্যমান তা আসলে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলারই একটি দিক। অন্যধারে প্রকৃতির গতিশীলতা মানুষের মধ্যে মুক্তিস্পৃহার আকার নিয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে এত যে বিচিত্র রূপের বিবর্তন ঘটে তার পেছনে শৃঙ্খলা এবং গতি দুই-ই সক্রিয়। মানুষের মধ্যেও তেমনি যুক্তি এবং মুক্তি দু'য়ের প্রতিঘাত ও সমন্বয়ের ফলে বিকাশ এবং সৃষ্টি সম্ভব হয়। ফলে উভয়েরই বিশ্ববীক্ষায় ক্লাসিক ও রোমান্টিকের সম্যক মিলন ঘটেছিল। তাছাড়া মানুষের বিকাশ যে আত্মনিগ্রহের পথে নয়, সুষমিত সম্ভোগের পথে, জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নয়, জগতের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্ক স্থাপন করে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে নয়, ইন্দ্রিয়বর্গের সূক্ষ্মতা সাধন করে—মানবতন্ত্রী নীতিশাস্ত্রের এই মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়েটের জীবন এবং সাহিত্যের অন্যতম মুখ্য সূত্র। গ্যয়টে কাণ্টের কাছ থেকে শিখেছিলেন মানুষ নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, তার মূল্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু কাণ্ট যখন নিয়মানুগত্যের ওপরে অতিরিক্ত জোর দিয়ে রেনেসাঁসি সম্ভোগতত্ত্বের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান নিগ্রহতত্ত্বকে সমর্থন করলেন, তখন গ্যয়টে তাঁর গুরুর নির্দেশ অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। জীবনের সার্থকতা বিকাশে এবং সম্ভোগ ছাড়া বিকাশ অসম্ভব—এ প্রত্যয় গ্যয়টের জীবনশিল্পের একটি প্রধান সূত্র, তাঁর সমস্ত

রচনার একটি মূল সুর। তাঁর তরুণ বয়সের অসমাপ্ত রচনা 'প্রমেথে-য়ুস'-এ এ-প্রত্যয়কে তিনি আশ্চর্য কাব্যরূপে ঘোষিত করেছিলেন; তারপর তাঁর বিরাট আত্মজীবনীতে (যার নাম দিয়েছিলেন "ডিখ্‌টুঙ্গ উন্ট্‌ হ্বারহেইট"—কল্পনা ও সত্য), তাঁর "রোমিশে এলেগিয়েন্‌"-এ, "হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ মেইস্টার"এর দুখণ্ডে, "হ্বিঙ্কেল্‌মানের জীবনী"তে, "ফাউস্ট" নাটকে, "পশ্চিম-পূব দিউয়ান"এর কবিতাগুলিতে, "একরমানের সঙ্গে আলাপে", বার বার তিনি নানাভাবে এ সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমার বিশ্বাস তিনি যে চেলিনি এবং দিদেরোর লেখা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন তার কারণ বিশেষ করে এই প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এঁরা ছিলেন তাঁর নিকট-আত্মীয় এবং এ প্রত্যয় যে বৃদ্ধকালেও তাঁকে ত্যাগ করে নি তার প্রমাণ চুয়াত্তর বছর বয়সে উলরিকার প্রেমে পড়ার পরে লেখা "মারীনবাড্‌-গাথা।"

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথও বৈরাগ্যসাধনের মধ্যে মুক্তির সন্ধান পান নি। কৃচ্ছ্রতাসাধনকে তিনি বলেছেন 'নেতিধর্ম'; মানুষের পক্ষে এ নেতিধর্ম 'আত্মঘাতী'। রবীন্দ্রনাথের জীবনশিল্পে তাই প্রকৃতি এবং প্রেম এত উঁচুতে স্থান পেয়েছে; তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় নৃত্য-গীত-চিত্রকলার তাই এত প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ কোনদিন বিবেকানন্দের বৈরাগ্যতত্ত্ব অথবা গান্ধীজীর আত্মনিগ্রহ নীতিকে স্বাগত করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন, "মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্বোধিত করে···মানুষের সকলের চেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে, সে সৃষ্টিকর্তা।" এ যাঁর বিশ্বাস, নিগ্রহের নীতিকে তিনি কি করে মানুষের ধর্ম বলে স্বীকার করবেন।

এ ছাড়া আরও এক ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যয়টের মধ্যে আশ্চর্য মিল ঘটেছিল। গ্যয়টের যখন চল্লিশ বছর বয়স (১৭৮৯) তখন ফরাসী দেশে বিপ্লব শুরু হয়। রুশ দেশে বিপ্লব শুরু হবার সময় রবীন্দ্রনাথের

বয়স ছাপ্পান্ন (১৯১৭)। রেনেসাঁসের পর আধুনিক ইতিহাসের এ দুটি সম্ভবত সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনা। স্বভাবতই গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁদের আপন আপন যুগের ঐতিহাসিক বিপ্লব গভীব অনুরণন তুলেছিল। গ্যয়টের 'ঝড়-ঝাপটা' যুগেব রচনার (যেমন "গ্যয়টস্ ফন্ বের্লিখিঙ্গেন্" অথবা "হ্বের্টবের দুঃখ") সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের সম্পর্ক স্পষ্ট। ভামির যুদ্ধে জার্মানরা যখন ফরাসীদের কাছে হেরে যায়, তখন গ্যয়টে তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "জগতের ইতিহাসে আজ এক নতুন যুগের শুরু হোল।" কিন্তু গ্যয়টেব যুক্তিবাদী মন ফরাসী বিপ্লবকে স্বাগত করেও তার মূল ত্রুটিকে লক্ষ্য করতে ভোলে নি। বল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লব ঘটে, তা যে মানুষের স্থায়ী কল্যাণসাধনে অপাবগ, প্রথম থেকেই সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সে বিপ্লবের প্রথম ফল বিশৃঙ্খলা এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত আসে জববদস্তি। গ্যয়টে জানতেন যে, জ্ঞান এবং সহযোগিতার মধ্য দিয়েই মানুষের যথার্থ বিকাশ সম্ভবপর হয়। আবেগের আতিশয্যে মানুষ বড়ো জোর ভাঙ্‌তে পাবে, কিন্তু গড়ার জন্ম চাই জ্ঞান, ধৈর্য, নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ। যে কাবণে তিনি একদা বোমান্টিক আতিশয্যকে পরিহার করে ক্লাসিক সংযমেব সঙ্গে বোমান্টিক অভীপ্সার সমন্বয়েব মধ্যে মানুষের বিকাশ সাধনার সূত্র নির্দেশ করে-ছিলেন, সেই কাবণেই ফবাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকাব করে নিয়েও তিনি তার মূঢ বিক্ষোভকে সমর্থন করতে পাবেন নি। তাঁর সমকালীন বিপ্লববাদীদের অনেকে এজন্য তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল, এমন কি বিশ্বাসঘাতক বলে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তাঁর সে সমালোচনার মধ্যে যে কতখানি দূবদর্শিতা ছিল, পরবর্তী কালে ফবাসী দেশের ইতিহাস তা বারবার প্রমাণ করেছে।

গ্যয়টের মত রবীন্দ্রনাথের মনকেও তাঁব যুগের ঐতিহাসিক বিপ্লব গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ১৯৩০ সালে তিনি পঙ্ককালের (১১-২৫

সেপ্টেম্বর) জন্য রাষ্ট্রের অতিথি হিসেবে রুশ দেশে যান ; সেখানে তিনি যা দেখেন এবং দেখে তাঁর যা মনে হয়, মোটামুটি তার খতিয়ান পাওয়া যায় 'রাশিয়ার চিঠি' বইটিতে। জড়তা, লোভ, অত্যাচার এবং জাতিগত ভেদবুদ্ধির বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি রুশ বিপ্লবের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল, তাঁর মত মানবতন্ত্রী যে তাকে অন্তর থেকে অভিনন্দিত করবেন এটা প্রত্যাশিত। সে প্রতিশ্রুতির মধ্যে যে কতখানি অসত্য মেশানো আছে, প্রত্যক্ষভাবে তা জানবার সুযোগ তাঁর ছিল না। যে সময় তিনি রুশ দেশে গিয়েছিলেন, তখন পর্যন্ত বিপ্লবের বীভৎস রূপ পুরোপুরি প্রকট হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া সেখানে ছিলেন তিনি মাত্র দু সপ্তাহ, তাও সরকারের সম্মানিত অতিথি হিসেবে, সমস্ত সময় মস্কো শহরে। রুশ ভাষা তিনি জানতেন না ; তাছাড়া তাঁর নিজেরই কথায় তাঁর "দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল (বিপ্লবের) আলোর দিক।"[৬] ফলে গ্যয়টের মত অতখানি প্রবল স্পষ্টতায় বিপ্লবের গলদ দেখিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু তার

(৬) এ প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করতে অনুরোধ করি যে কবি যখন ১৯২৬ সালে মুসোলিনীর অতিথি হয়ে ইতালি যান, তখন সেখানেও এই একই কারণে মুসোলিনীর প্রভূত প্রশস্তিবাচন করেছিলেন। ইতালিতে তিনি ছিলেন সপ্তাহ তিনেকের মত (৩০ মে—২২ শে জুন) এবং শুধু রোমে আটকা না থেকে অনেকগুলো শহর ঘুরেছিলেন। তা সত্ত্বেও ফাসিজম্-এর বীভৎস স্বরূপ গোড়াতে তাঁর চোখে পড়ে নি। পরে ইতালি থেকে ফেরার পথে রঁলা, সালভাদোরির স্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে আলাপের ফলে বুঝতে পারেন কি আদর্শে কি ক্রিয়াকর্মে ফাসিজম্ মানবতার আমূল বিরোধী। তখন তিনি ফাসিজম্-এর তীব্র সমালোচনা করে এণ্ড্রুজ সাহেবকে এক চিঠি লেখেন এবং সে চিঠি ১৯২৬ এর ৪ আগস্ট বিলেতের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত হয়। কমিউনিজম্ এবং রুশিয়া সম্বন্ধে ঐ ধরনের খাঁটি খবর দেনেওয়ালা কোনো লোকের সঙ্গে কবির দেখা হয়েছিল বলে জানা নেই। সম্প্রতি খোদ খ্রুশ্চেফ্ সাহেব স্টালিনের আমল সম্বন্ধে যেসব কথা ফাঁস করেছেন তাতে স্টালিন-মুসোলিনীর ফারাক করা শক্ত।

মানে এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী অন্তর্দৃষ্টি বিপ্লবের বিরাটত্ব দেখে একেবারে সংবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বরং 'রাশিয়ার চিঠি' খোলামন নিয়ে পড়লে স্পষ্টই নজরে পড়ে, এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রুশ বিপ্লবের অন্তর্নিহিত ট্রাজেডীর অনেকটাই তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। গোড়ার দিকের চিঠিগুলিতে যতটা নির্ভেজাল প্রশংসা আছে, শেষের চিঠিগুলিতে ক্রমেই তা সংশয়মিশ্রিত হয়ে উঠেছে। পঞ্চম চিঠিতেই তিনি আভাস দিয়েছেন যে, বিপ্লবোত্তর রুশে মানুষের কোনো কোনো মৌলিক সমস্যাকে সমাধান করার নামে অস্বীকার করার চেষ্টা চলছে। "সে জন্যে জবরদস্তির সীমা নেই।" ত্রয়োদশ চিঠিতে খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, "মানুষের ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয়, তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে।" পরিশেষে রুশ দেশ সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসাবাচন পড়ে দেশবাসী যাতে ভুল সিদ্ধান্ত না করে, সেজন্য উপসংহারে অনেকটা বিস্তারিতভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বিপ্লবের কোন দিকটা সদর্থক আর কোন দিকটা নঙর্থক। স্বভাবতই তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন সদর্থক দিকটার ওপরে; কিন্তু বিপ্লবের নঙর্থক দিকটা যে তাঁকে কম পীড়িত করে নি, উপসংহার থেকে দু একটা উদ্ধৃতি দিলেই সেটা স্পষ্ট হবে। "সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এ অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।...ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ

করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা একতরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙ্গে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মারধোর করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।...উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না যাদের তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে; অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না।" উপসংহারের একেবারে শেষে লিখেছেন, "মানব সমাজে সামঞ্জস্য ভেঙ্গে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে।...সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ব করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে।" এ যেন সেই দেড়শ' বছর আগে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে গ্যয়টের সাবধান বাণী। রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যয়টে উভয়েই গোষ্ঠীর চাইতে ব্যক্তিকে, শক্তির চাইতে শিক্ষাকে, রাষ্ট্র শাসনের চাইতে স্বেচ্ছাকৃত সমবায়পদ্ধতিকে বেশী মূল্যবান বলে জানতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের উপমা নিয়েই বলা চলে, আগ্নেয়গিরির উৎপাত দেখে তাঁরা সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে ঘোষণা করতে পারেন নি।

সাত

এ পর্যন্ত আমরা গ্যয়টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেখানে মিল, সে বিষয়েই আলোচনা করেছি। কিন্তু এঁদের মধ্যে মিল আছে বলে অমিলও নেহাৎ কম নয়। এ অমিল শুধু যদি পার্থক্যের ব্যাপার হ'ত তবে তা নিয়ে আলোচনা না করলেও চলতো। যে কোন দু'জন মানুষই

যখন কোনো না কোনো জায়গায় পরস্পর থেকে পৃথক, তখন দু'জন বিশেষভাবে বিকশিত মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে বলাই বাহুল্য। কিন্তু গ্যয়টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক জায়গায় আমূল বিরোধ আছে এবং আমার ধারণা এই বিরোধের স্বরূপটা না বুঝতে পারলে বিশ্বভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্থান কি, তা যাচাই করা সম্ভব হবে না।

গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরোধের মূল কথাটা কি? এক কথায় বলা যায়, এ বিরোধ অস্তিত্বতন্ত্রীর সঙ্গে ভাববাদীর, সত্য-সন্ধিৎসুর সঙ্গে শান্তিকামীর। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ অস্তিত্বকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন অথবা সত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ কম ছিল। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে তাঁকে গান্ধীজীর সমালোচক করে তুলেছিল। রামকৃষ্ণের চাইতে রামমোহন, বিবেকানন্দের চাইতে বিদ্যাসাগর তাঁকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করেছেন। এসবই সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, মানবতন্ত্রী হয়েও রবীন্দ্রনাথ মানবতন্ত্রের যেখানে চরম পরীক্ষা, সেখানে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে সত্যের মূল্য স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু যখনই সত্যানুসন্ধানের পথে দুরারোহ সংশয় মাথা তুলেছে, তিনি মানবতন্ত্রেব কঠিন নির্দেশ ভুলে প্রাক্তন প্রত্যয়ের শান্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি জানতেন, প্রতি মানুষই অসামান্য, অথচ তাঁর বহু রচনায় মানুষের প্রাতিস্বিকতা ঔচিত্যবোধের চাপে খণ্ডিত এবং বিকৃত হয়েছে। অস্তিত্বের দুর্বহ জটিলতা এবং দুঃসমাধেয় বিরোধের মুখো-মুখি হয়ে তিনি আড়াল খুঁজেছেন বিমূর্ত ভাবের সরল সমন্বয়ে। গ্যয়টেও যে তা কখনও করেন নি তা নয়; কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে সন্দেহ থাকে না তাঁর জীবনবোধ এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক বেশী বলিষ্ঠ, পরিণত, দায়িত্বশীল। সমন্বয়ের শান্তি তিনিও চেয়েছেন, কিন্তু সত্যের পথ থেকে সরে যেয়ে নয়। ভাবের দাবীকে

তিনি অগ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু তার খাতিরে অস্তিত্বের সামান্যীকরণে তিনি অপারগ ছিলেন। ঔচিত্যবোধ তাঁর কিছু কম ছিল না, কিন্তু তার চাইতেও বেশী ছিল জীবনবোধ। আমার বিশ্বাস, এই কারণে রেনে-সাঁসের উত্তরসাধক হিসেবে গ্যয়টে যতখানি সার্থক, রবীন্দ্রনাথকে তা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্র গ্যয়টের মানবতন্ত্রের তুলনায় অস্তিত্বনিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেকটা দুর্বল। তাঁর কল্পনা মানুষের ভাবরূপকে নিয়েই ব্যস্ত ; তার সমগ্র রূপটিকে স্বীকার করার প্রৌঢ় দুঃসাহস তিনি অর্জন করেন নি। এইখানেই বিশ্বভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের তুলনায় গ্যয়টের শ্রেষ্ঠত্ব। এই মৌলিক ত্রুটি থাকার ফলে আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ লেখককে পৃথিবীর চিরকালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সমপর্যায়ে ফেলা কঠিন।

ব্যাপারটাকে নানাদিক থেকে বিচার করা চলে। যিনি যথার্থ সত্যসন্ধ, কোন ঔচিত্যবোধের নির্দেশেই যা প্রকৃত তাকে তিনি চোখ ঠারতে বা চাপা দিতে পারেন না। অস্তিত্বের কোনো কোনো বিশেষ দিক তাঁর কাছে পীড়াদায়ক ঠেকতে পারে, কিন্তু পীড়াদায়ক বলেই তাকে তিনি অসত্য বলতে গররাজী। যখন তিনি মানুষের কথা লিখতে বসেন, তখন একথা তিনি ভাবতে পারেন না যে মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রবল বলে তার বাকী দেহটা অপ্রাসঙ্গিক। মানুষ যে শুধু জ্ঞানচর্চা করে না, সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না, মহৎ আদর্শ কল্পনা করে তার দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে না, মানুষের যে আরও বহু দিক আছে, সে যে ক্ষুৎপিপাসার দ্বারাও চালিত হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে কিম্বা সঙ্গমে পরিতৃপ্তি না ঘটলে তার বিশ্ববীক্ষা যে ব্যাহত হতে পারে, যিনি সত্যসন্ধ, তিনি মানব-অস্তিত্বের এই জটিল, বিচিত্র বহুমুখীতা বিষয়ে সর্বদাই জাগ্রত, নিয়ত কৌতূহলী। ভাববাদীদের বিশ্বাস যে মানুষের এই সমগ্ররূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় কোন ফায়দা নেই ; তার মধ্যে শুধু যেটুকু শ্রেয় (তাঁদের বিচারে) সেটুকুকে ফুটিয়ে তোলাতেই জ্ঞানের সার্থকতা। অর্থাৎ তাঁরা শুরু করেন মানুষ সম্বন্ধে একটি কাল্পনিক

আদর্শ নিয়ে এবং মানুষের যেসব দিক এই পূর্বকল্পিত ধারণার অনুকূলে শুধু সেগুলিকে প্রাধান্য দিয়েই তাঁরা খুশি। এককালে পশ্চিম ইয়োরোপে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন প্লেটো। কিন্তু সেকালে অন্তত বিদগ্ধজনদের মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ স্বীকৃতি পায় নি। রোমক সভ্যতার পতনের যুগে ইয়োরোপ খ্রীষ্টধর্ম আশ্রয় করার পর থেকে প্রায় এক হাজার বছর ধরে পশ্চিমী মানস এই মনোভাবের দ্বারা অভিভূত থাকে। রেনেসাঁসের যুগে চিন্তাশীল মানুষরা আবার নতুন করে বুঝতে আরম্ভ করেন যে, অবিমিশ্র ভাববাদ সত্যসন্ধিৎসার নিতান্ত পরিপন্থী, যে যথার্থ জ্ঞানের জন্য অস্তিত্বের জটিল সমগ্র রূপটির অনুধাবন প্রয়োজন। সমগ্রসত্যের অনুসন্ধান একধারে যেমন মানুষের বিকাশ-সম্ভাবনার দিগন্তকে প্রসারিত করে দেয়, অন্যধারে তেমনি সেই বিকাশসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে যথার্থতর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপরে। লেওনার্দো, এরাজমুস, সেক্সপীয়র এবং তাঁদের পরের যুগে দিদেরো প্রভৃতির মারফৎ রেনেসাঁসের এই অস্তিত্বতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্যয়টের ওপরে বর্তায়। রবীন্দ্রনাথ মানবতন্ত্রের অন্যান্য প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও রেনেসাঁসের এই দিকটিকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করতে পারেন নি। এ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কল্পনায় প্রভাব অবশ্যই ফেলেছিল, তাঁর নানা রচনায় সে প্রভাবের কিছু কিছু ছাপ চোখে পড়ে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে সন্দেহ থাকে না, ভাববাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি পুরোপুরি অতিক্রম করার সামর্থ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর অনায়ত্ত রয়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর কাব্যে জীবনকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়েছে জীবনদেবতা; তার দর্শনে মানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের চাইতে বেশী মূল্য পেয়েছে তাঁর কাল্পনিক ব্রহ্মত্ব; তাঁর নাটক উপন্যাসে বিস্তর মহৎভাবের সমাবেশ ঘটা সত্ত্বেও এমন চরিত্র দুর্লভ যারা সেক্সপীয়র, গ্যয়টে অথবা ডস্টয়েভ্স্কীর চরিত্রদের মত জটিল এবং জীবন্ত।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সাহিত্য বিষয়ক নানা

প্রবন্ধে, 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালায় এবং তাঁর আত্মজীবনী জাতীয় নানা রচনায় খুব স্পষ্ট। গ্যয়টে তাঁর বিরাট আত্মজীবনীতে নিজের সম্বন্ধে প্রায় কোন কিছুই গোপন করেন নি। এদিক থেকে তিনি রেনেসাঁসের শিল্পী বেনভেনুতো চেলিনির শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনা গ্যয়টের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত; যাও-বা লিখেছেন, তাতে নিজের আদর্শ রূপটিকেই ফোটাবার চেষ্টা করেছেন, সমগ্র রূপটিকে স্বীকার করেন নি। ফলে তাঁর এসব লেখা থেকে তিনি যা ছিলেন তার চাইতে তিনি যা হতে চেয়েছিলেন তার খবরই আমরা বেশী পাই। বস্তুত ঋষি, বিশ্বকবি, গুরুদেব ইত্যাদি আখ্যার আড়ালে মানুষ-রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস আজো আমাদের অজানা। প্রভাতবাবুর 'রবীন্দ্র জীবনী'তে কিছু কিছু আভাস আছে, কিন্তু তা শুধু আভাসমাত্র। এমনকি যে মানুষ সারা জীবন ভালবাসার ওপরে এত গান, কবিতা, কাহিনী, নাটক লিখে গেলেন, তিনি নিজে কখনো কারো প্রেমে পড়েছিলেন কিনা, এসম্বন্ধে পর্যন্ত কোথাও কোনো স্পষ্ট উল্লেখ রেখে যান নি।

একথার প্রতিবাদে অবশ্যই বলা যেতে পারে, তাতে কি আসে যায়? মানুষ-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মীয়তা নাই হ'ল, স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ত রয়েছেন, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেটুকু প্রকাশিত করে রেখে গেছেন, তাইত যথেষ্ট। আসলে তাঁর সৃষ্টির জন্যেই ত তিনি আমাদের কাছে মূল্যবান। সেক্সপীয়রের জীবন সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি। প্রথম নজরে এটা খুব লাগসই জবাব মনে হতে পারে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে এ যুক্তির গোড়াতে মস্ত একটা গলদ আছে। সেক্সপীয়রের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না বটে, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে জীবনের কোন অভিজ্ঞতাকেই তিনি কাল্পনিক আদর্শের খাতিরে খারিজ করেন নি। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যতই প্রকাশের দক্ষতা অর্জন করেছেন, ততই জীবনের নানা জটিল এবং দুষ্প্রকাশ্য অভিজ্ঞতাকে আদর্শবাদী শুচিতার মোহে পাশ কাটানোর

মনোভাব তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। এতে মানুষ হিসেবে তাঁর কতটা লাভ বা ক্ষতি হয়েছে জানি না, কিন্তু লেখক হিসেবে যা লোকসান হয়েছে, তা অপূরণীয়। জীবনকে সমগ্রভাবে স্বীকার করতে না শিখলে আর যাই হওয়া সম্ভব হোক, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক হওয়া অসম্ভব। ভাষার ওপরে তাঁর যতই দখল থাক, ভাবনা তাঁর যতই মহৎ হোক, এই একটি জায়গায় ঘাটতি হলে কোনো কিছুর জোরেই তা পূরণ করা চলে না। রবীন্দ্রনাথও তা পারেন নি। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আমরা যে বিশেষ কিছু জানি না, তাতে কিছু না যেতে আসতে পারে; কিন্তু অপ্রীতিকর খুঁটিনাটিকে এড়িয়ে যাওয়ার যে মনোভাব তাঁর জীবন এবং সাহিত্যসাধনাকে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে সেটি মোটেই অবান্তর নয়। এবং এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ যে এই মনো-ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই অসামান্য সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি এমন কিছু লিখে যেতে পারলেন না, যা সাহিত্যমূল্যে "মহাভারত" অথবা "ওডিসি", "ইন্‌ফর্‌নো" অথবা "কিং লীয়ার," "ফাউস্ট" বা "ওয়র অ্যাণ্ড পীস"-এর সমতুল্য।

রবীন্দ্রনাথের এই গূঢ় দুর্বলতা বিশেষ করে তাঁর উপন্যাস এবং নাটকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জীবনবিমুখ আদর্শবাদের শরণ না নিলে তিনি কি ধরনের ঔপন্যাসিক হতে পারতেন, তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর প্রথমদিকের লেখা বড় গল্প "নষ্ট নীড়" এবং উপন্যাস 'চোখের বালি'তে। এ দুটির রচনা কাল ১৯০১; ভাববাদের প্রভাব এখানে অপেক্ষাকৃত অপ্রবল। তবে এযুগে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনারীতি ততটা পরিণতি অর্জন করে নি; তা না হলে 'নষ্ট নীড়' এবং 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলে পরিগণিত হতে পারত। কিন্তু এদুটির ক্ষেত্রেও ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অপ্রবল বলে একেবারে অনুপস্থিত নয়। বিশেষ করে 'চোখের বালি'র কাহিনীকে শেষদিকে যেভাবে তালেগোলে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা কাহিনীর দিক থেকে যেমন

অসঙ্গত, জীবনের দিক থেকে তেমনি অবাস্তব। বিহারী-বিনোদিনীর সমস্যার মধ্য দিয়ে লেখক জীবনের যে নিত্য অথচ জটিল রূপটিকে ফোটাতে পারতেন, সামাজিক ঔচিত্যবোধের খাতিরে তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত সরল এবং বিকৃত করে সে সুযোগ স্বেচ্ছায় নষ্ট করেছেন। 'নৌকাডুবি'তে এই অসঙ্গতি এবং অবাস্তবতা আরো স্পষ্ট ; এটি বোধহয় রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতম রচনা। 'নৌকাডুবি'র (১৩১০-১২) পর প্রকাশিত হয় "গোরা" (১৩১৪-১৬) ; আকারে এটিই তাঁর সব চাইতে বড় উপন্যাস। "গোরা"র উপজীব্য ভাব যেমন মহৎ, এর গদ্যরীতিও তেমনি পরিণত। তবু উপন্যাস হিসেবে "গোরা"কে বিশেষ উঁচুতে স্থান দেওয়া চলে না। গোরা-চরিত্র লেখকের কল্পনায় একটি ভাবরূপ হিসেবে দেখা দিয়েছে, পুরো মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে নি। গোরার বক্তব্য আমাদের ভাবায় বটে, কিন্তু গোরার মনুষ্যত্ব আমাদের কচিৎ স্পর্শ করে। বরং উপন্যাস হিসেবে "চতুরঙ্গ" (১৩২১) "গোরা"র তুলনায় সার্থক ; এখানে রবীন্দ্রনাথ জীবনের জটিল সমগ্র রূপটিকে অনেক বেশী নিষ্ঠা এবং সাহসের সঙ্গে ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখানেও প্রধান চারটি চরিত্র ভাবের কোঠা পেরিয়ে জীবনের ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করে নি। পাউণ্ডের ভাষায় তারা পার্স্‌ন্‌ নয়, পার্সোনা ; মানুষ নয়, মুখোশ। রবীন্দ্রনাথ যে কেন সার্থক ঔপন্যাসিক হতে পারেন নি, তার সব চাইতে প্রামাণিক ব্যাখ্যা মেলে "চতুরঙ্গে"র ঠিক পরেই প্রকাশিত "ঘরে বাইরে" (১৩২২) উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গদ্যরীতি এখানে পূর্ণ বিকাশলাভ করেছে ; তাঁর মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গী এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। তবু হায়, "ঘরে বাইরে" একটি দীর্ঘ রূপককাহিনীর বেশী কিছু হতে পারল না। ভূপতি নিখিলেশে রূপান্তরিত হয়ে মহত্ত্ব নিশ্চয়ই অর্জন করেছে, কিন্তু তার ফলে সে বঞ্চিত হয়েছে মনুষ্যত্বে। গোরার মত নিখিলেশও প্রায় একটি জ্যামিতিক কল্পনা ; তাকে জীবন্ত ব্যক্তি-মানুষ ভাবা অসম্ভব। "ঘরে বাইরে"র প্রায় বারো বছর পরে

"যোগাযোগ" (১৩৩৪-৩৫) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আর একবার চেষ্টা করেছেন জীবনের দুঃপ্রসহ সত্যকে কল্পনায় স্বীকার করতে। "নষ্টনীড়" এবং "চোখের বালি"তে যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা অনেকখানি সার্থকায়িত হয়েছে "যোগাযোগে।" রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে মধুসূদনের মত চরিত্র আর দ্বিতীয়টি আমাব অন্তত চোখে পড়ে নি। মধুসূদন এবং কুমুকে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে জীবনের একটি নিষ্ঠুর-তম সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন। আমার বিশ্বাস, এই উপন্যাসটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এখানে তিনি প্রায় শেক্সপীয়র, গ্যয়টে, টল্‌স্টয়্-এর সমপর্যায়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি শেষরক্ষা করতে পারেন নি। একধারে তিনি মধুসূদনের রূঢ় সত্য থেকে আশ্রয় খুঁজেছেন বিপ্রদাসের অস্পষ্ট অশরীরী ভাব রূপে; অন্যধাবে কুমুর সমাধানহীন সমস্যাব যন্ত্রণা সইতে না পেরে তিনি মাঝপথেই কাহিনীতে ছেদ টেনেছেন।[৭] 'যোগাযোগে' লেখক নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়েছিলেন; ফলে 'হ্যামলেটের' মত এখানেও এক অনির্দেশ্য অসম্পূর্ণতা পাঠককে একই সঙ্গে লুব্ধ করে, পীড়া দেয়। অবিনাশ ঘোষালের কাহিনী তাই শেষ পর্যন্ত আর কোনদিনই লেখা হল না। যে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ইতিমধ্যেই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা নিয়ে সে কাহিনী লেখা সম্ভব হত না। ফলে 'চোখের

---

(৭) "যোগাযোগ" সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গোক্তি শুধু ঈর্ষাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। "যোগাযোগ বইখানা যখন 'বিচিত্রা'য় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় বুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবল-পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ-অব-ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্তে এসে।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত "শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী" পৃঃ ১৪৯)। শরৎচন্দ্র যোগাযোগের মত কোনো উপন্যাস লিখতে পারেননি বলে "যোগাযোগ" সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ অযৌক্তিক বলা চলেনা।

বালি'র পরে যেমন 'নৌকাডুবি', 'চতুরঙ্গের' পরে যেমন 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগের' পরে তেমনি তিনি আড়াল নিলেন 'শেষের কবিতা'র জীবনবিমুখ ভাবোচ্ছ্বাসে। 'শেষের কবিতা' (১৩৩৫) যে 'যোগাযোগের' (১৩৩৪-৩৫) অব্যবহিত পরের রচনা, রবীন্দ্র মানসের বিশ্লেষণে এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঘটনা। 'নৌকাডুবির' মত এখানেও শেষ পর্যন্ত জোড়ে জোড়ে পাত্রপাত্রীদের খাসা মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা সত্বেও 'শেষের কবিতা' যদি 'নৌকাডুবি'র মত অত নিকৃষ্ট না ঠেকে, তার প্রধান কারণ ১৩৩৫এ রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং লিখনরীতি ১৩১০-১২ সালের তুলনায় অনেক বেশী পরিণত। কিন্তু জীবনবোধের দিক থেকে 'শেষের কবিতা' নিতান্ত দরিদ্র ; চতুর অতি-কথনে সে দারিদ্র্য ঢাকা না পড়ে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে আরও প্রত্যক্ষ। তাঁর কৌতুকনাট্যগুলিতে এ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব প্রথম পাঠে হয়ত চোখে পড়ে না ; কিন্তু মোলিএর অথবা শেক্সপীয়রের পরিণত কালের কমেডিগুলির সঙ্গে তুলনা করে পড়লে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় রচনায় জীবনবোধ কত দুর্বল। 'মেজার ফর মেজার' অথবা 'ল্য মিজাঁত্রোপ'-এর মত নাটক তিনি কোনো দিনই লিখতে পারেন নি। অন্যধারে তাঁর কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য অথবা তত্ত্বনাট্য—সব ক্ষেত্রেই চরিত্র সৃষ্টি নিতান্ত অপ্রধান রয়ে গেছে। এসব রচনায় রস অথবা ব্যঞ্জনার অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে জীবন্ত মানুষের। এরা আমাদের আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু 'কাথারসিস' ঘটায় না। নাচ, গান, ছন্দ, ভাষা এবং তত্ত্বের সম্পদে এ অভাব সাময়িকভাবে আমাদের দৃষ্টি এড়াতে পারে ; কিন্তু এ অভাব যে কত বড় অভাব, তা আমরা তখনি বুঝতে পারি যখন রবীন্দ্রনাথের নাটকের পাশে ইউরিপিদেস, শেক্সপীয়র অথবা ও'নীলের নাটক পড়ি। 'রাজা' 'অচলায়তন,' 'শারদোৎসব,' 'রক্ত করবী,'

'ডাকঘর,' 'ফাল্গুনী' এমনকি 'বাঁশরী'তে পর্যন্ত এমন একটিও চরিত্র নেই যাকে জীবন্ত ব্যক্তিমানুষ বলে মনে হতে পারে। কোনো কোনো নৃত্যনাট্যে জীবন্ত চরিত্রের কিছুটা আভাস মেলে—যেমন 'চণ্ডালিকা,' 'শ্যামা' এবং 'চিত্রাঙ্গদা'। আমার ধারণা নাটক হিসেবে এ তিনটিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এদের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ আভাসের বেশী আর এগোন নি—মূল ভাবটিকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিচরিত্রের জটিলতাকে সরল করে এনেছেন। অথচ নাটকে চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের যে একেবারে ছিল না তা নয়। অন্তত তাঁর প্রথম যুগের দুটি নাটকে—'রাজা ও রাণী' (১২৯৬) এবং 'বিসর্জন' (১২৯৭)—এ ক্ষমতার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তখনো পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যসাধনা ভাববাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। বিক্রম এবং সুমিত্রা, রঘুপতি এবং গুণবতীর মত জীবন্ত চরিত্র রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের লেখা আর কোনো নাটকে চোখে পড়ে না। দুর্ভাগ্যবশত এ নাটক দুটি লেখার সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের রীতি প্রকরণে যথেষ্ট নিপুণতা অর্জন করেন নি; ফলে এদের মধ্যে বিস্তর রূপগত ত্রুটি বর্তমান। এদের মধ্যে মহৎ রচনার প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু তার ঠিক সার্থকায়ন ঘটেনি। সাহিত্য কর্মে সেই একান্ত প্রয়োজনীয় নিপুণতা যখন তাঁর আয়ত্তে এল, তার আগেই তাঁর মন ভাববাদী ভীরুতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বৃদ্ধবয়সে 'রাজা ও রাণী' কাহিনীটিকে ভেঙ্গেচুরে ঘষেমেজে যখন তিনি 'তপতী' (১৩৩৬) রচনা করলেন, তখন সে নতুন নাটকে মূল রচনার যা ছিল বৈশিষ্ট্য প্রথমেই তা বাদ পড়ল। নাট্যকারের পক্ষে ভাববাদ যে কত মারাত্মক 'রাজা ও রাণী'র বিক্রম-সুমিত্রার সঙ্গে 'তপতী'র বিক্রম-সুমিত্রার তুলনা করলেই সেটি ধরা পড়বে। যারা ছিল জীবন্ত নরনারী, তারা পর্যবসিত হয়েছে তত্ত্ব কল্পনায়। বাংলা ভাষায় 'ইফিগেনী', 'ওথেলো' অথবা 'ফাউস্টের' মত নাটক আজো তাই লেখা হল না।

আট

ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সাহিত্যিক শুধু যে অস্তিত্বের জটিল সমগ্র রূপ থেকে মুখ ফিরিয়ে তত্ত্বের খণ্ডিত সারল্যে আশ্রয় নেন তাই নয়; অস্তিত্বের মধ্যে যখনই কোনো দুঃসমাধেয় সমস্যা অথবা দুরতিক্রম্য বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে তখনই তিনি সমন্বয়ের শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সমন্বয়ের আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য; কিন্তু সমন্বয়ের প্রয়োজনে যদি বিরোধের গভীরতাকে অপ্রধান বলে উড়িয়ে দিই, তাহলে যে সমন্বয় আমরা কল্পনা করব তাতে শান্তি হয়ত মিলতে পারে, কিন্তু তাতে সত্যের ঘাটতি হওয়ায় তার ওপরে নির্ভর করা চলবে না। এ ধরনের সমন্বয়ের শান্তিকে লক্ষ্য করেই 'ইস্ট কোকার'এ এলিয়ট লিখেছেন:

> The serenity only a deliberate hebetude,
> The wisdom only the knowledge cf dead secrets
> Useless in the darkness into which they peered
> Or from which they turned their eyes.

কি জীবনে কি সাহিত্যে এ ধরনের সমন্বয় যেমন সুলভ, তেমনি স্বল্পমূল্য। এর ওপরে দাঁড়িয়ে উগোর মত লেখক হয়ত লিখতে পারেন, কিন্তু গ্যয়টের মত লেখক পারেন না। মহৎ জীবন এবং মহৎ সাহিত্য বিরোধের মূলে পৌঁছে সমন্বয়ের সন্ধান করে; লেইব্‌নিট্‌স্‌-এর থিওডিসীর চাইতে আবেলারের জীবনী তাই অনেক বেশী অর্থসমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথও একথা জানতেন, কিন্তু সে জ্ঞান তাঁকে ভাববাদী প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করে নি। তাঁর দর্শনচিন্তায় শান্তির চাইতে সত্যকে অনেক সময়েই বড় বলে স্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সে স্বীকার ন্যায়সঙ্গত পরিণতি লাভ করে নি। বিরোধকে তিনি বাইরের ব্যাপার বলে দেখিয়েছেন; অস্তিত্বের গভীরতম স্তর থেকে যে বিরোধের উদ্ভব, তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। হয়ত বা পরিচয় ছিল, কিন্তু চেতনার স্তরে তাকে স্বীকার করার সাহস এবং

সামর্থ্য ছিল না। ভালো এবং মন্দের পার্থক্য তাই তাঁর রচনায় অতি-মাত্রায় স্পষ্ট, কিন্তু অস্তিত্বের সমগ্র রূপের মধ্যে ভালো আর মন্দ যে কি অচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত সেটি তাঁর লেখায় কখনো ধরা পড়ল না। নিখিলেশ, বিপ্রদাস, অতীন নিছক ভালো; আর সন্দীপ, মধুসূদন, বটু নিখাদ মন্দ। এ বিশুদ্ধতা নীতিশাস্ত্রে হয়ত চলতে পারে, কিন্তু জীবনে এবং সে কারণে সাহিত্যে এ কল্পনা নিতান্ত অসত্য। শেক্সপীয়রেব হ্যামলেট বা ওথেলো যে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো পাত্র-পাত্রীর চাইতে সত্য, তার কারণ স্রষ্টা এদের ক্ষেত্রে মানুষের আদর্শ গুণাবলীকে বিরংসা, ক্ষমতাস্পৃহা, সন্দিগ্ধতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি আদিম বৃত্তি থেকে ছাঁকাই করে আলাদা পরিবেশন করেন নি। গ্যয়টের ফাউস্ট প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করছে; লালসা এবং মমতা, সত্যানুসন্ধান এবং সম্ভোগাসক্তি, আত্মপ্রত্যয় এবং আতঙ্ক তার চবিত্রে নিয়ত যুধ্যমান; আত্মবিরোধের হাত থেকে সে পালাতে চায় নি, তার মধ্য দিয়ে সে মুক্তির সাধনা করেছে। ফাউস্ট এবং মেফিস্টোর সম্পর্ক তাই শাদার সঙ্গে কালোর সম্পর্ক নয়; তারা একই সঙ্গে পরস্পরের বিরোধী এবং পবস্পরের আত্মীয়। মেফিস্টো যদি ফাউস্টের অস্তিত্বের মূলে না বাসা বাঁধত, তবে ফাউস্টের পক্ষে মুক্তিব জন্যে সাধনা কবাই সম্ভব হত না। নিখিলেশদের অন্তরে কোনো যথার্থ বিরোধ নেই; তাদের বিবোধ বাইরের সঙ্গে। তাই তাদের মধ্যে না আছে ট্র্যাজেডির স্বাদ, না মুক্তির। গ্যয়টের নায়ক যে আর্ত আনন্দের সম্ভোক্তা (Dem Taumel Weih' ich mich, dem Schmerzlichen Genuss) রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব পাত্রপাত্রীই সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

সাহিত্যে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পেলে এসব ছাড়া আরো একটি বিপদের সম্ভাবনা আছে। সেটি হল ভাষার ক্ষেত্রে শুচিবায়ু-গ্রস্ততার বিপদ। এ বিপদ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অন্য প্রবন্ধেও আমি

আলোচনা করেছি। ত্রুটিটা ভাষার ক্ষেত্রে প্রকট হলেও তার প্রকৃত উৎস ভাবের ক্ষেত্র। জীবনকে আদর্শ অনুযায়ী কোনো ছকের মধ্যে ফেলে সাহিত্যিক যখন তাকে ফুটিয়ে তুলতে চান, তখন তাঁর ভাষাও আর সেই ছকের বন্ধন কাটাতে পারে না। ভাবের খাতিরে ভাষাকেও তখন ধোপদুরস্ত রাখতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যতদিন ভাববাদের পুরো-পুরি খপ্পরে পড়েন নি, ততদিন তাঁর ভাষায় দোষ হয়ত অনেক ছিল, কিন্তু কৃত্রিমতা এবং অস্বচ্ছতা ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যত তিনি ভাববাদী শুচিতার দিকে ঝুঁকেছেন, ততই তাঁর ভাষা সাধারণ মানুষের আটপৌরে ভাষা থেকে সরে গেছে। তাঁর অনেক মূল্যবান চিন্তা যে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকদের মনে বিশেষ কোনো ছাপ রাখতে পারে নি, তার হয়ত একটা কারণ তাঁর পরিণত রচনার, বিশেষ করে গদ্য রচনার, এই ভাষাগত অনাত্মীয়তা। এ মনোভাবের সবচাইতে উগ্র প্রকাশ ঘটেছে 'শেষের কবিতা'য়; কাহিনী, পাত্রপাত্রী, ভাষা সব দিক থেকে এ বইটির জীবনবিমুখতার তুলনা নেই। তা সত্ত্বেও এ বই যে আমাদের চোখ ধাঁধায়, তার কারণ এর উপাদান এবং উপজীব্য স্বল্পমূল্য হলেও শিল্পনৈপুণ্যে বইটি অসামান্য। কিন্তু মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য শুধু শিল্পনৈপুণ্যই যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ ভাষার ক্ষেত্রেও ভাববাদী হওয়ার ফলে একধারে তাঁর কল্পনার জগৎ থেকে জীবনের অনেক দিককে বাদ দিতে হয়েছে; অন্যধারে যে দিকগুলিকে তিনি বেছে নিয়েছেন, সেগুলির রূপায়ণের মধ্যেও অনেক সময় অস্বচ্ছতা এবং অবাস্তবতা রয়ে গেছে। ফাউস্ট অথবা মার্গারেটার মত চরিত্র তাঁর কল্পনায় কোনো দিন ধরা পড়ল না। 'মা আমার বেশ্যা, বাপ আমার ঠগ' (Meine Mutter die Hur...Mein Vater der Schelm) রবীন্দ্রনাথের কোন নায়িকা কি বলতে পারত। অন্যধারে নিখিলেশ, সন্দীপ, বিমলারা হয়ে রইল কল্পলোকের ছায়াময় অধিবাসী। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে রচিত একটি কবিতায় তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন,

আপন অন্তরালে বাস করে যে মানুষ, তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশের দ্বার তিনি সর্বত্র পান নি।

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

এ স্বীকারোক্তির মধ্যে অনেকখানি বিনয় মেশানো ছিল। কিন্তু বিনয় বাদ দিয়ে এ কথার মধ্যে যে কতখানি নিষ্ঠুর সত্য বর্তমান, তা বোধ হয় কবি নিজেও বোঝেন নি। তিনি যে কৃষাণের জীবনের শরিক হতে পারেন নি এটাই তাঁর সুরের প্রধান অপূর্ণতা নয়। যাঁদের সঙ্গে তাঁর অন্তরের পরিচয় আছে বলে তিনি মনে করেছিলেন, তাদের কথাও যে তিনি সত্য করে বলতে পারলেন না, এটাই তাঁর সাহিত্যের সব চাইতে বড় ত্রুটি। এ না পারার একটা প্রধান কারণ হল তাঁর ভাববাদপুষ্ট রুচি। সাধারণ মানুষ—শুধু কৃষাণ মজুরই নয়, উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরাও—যে ভাষায় সচরাচর ভাবে, আলাপ করে, তাদের সুখ দুঃখ, রাগবিদ্বেষ প্রকাশ করে, এ রুচি ক্রমেই তাঁকে সে ভাষার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছিল। অমিত, অতীন অথবা বাঁশরীর ভাষায় তিনি শুধু তাঁর কল্পলোকের নায়কনায়িকা ছাড়া আর কোন্ স্ত্রী-পুরুষেরই বা আত্মীয়তা অর্জন করতে পারতেন? মানবতন্ত্রী হয়েও তাই তিনি শেষ পর্যন্ত একথা বলতে পারলেন না, আমি মানুষ সুতরাং মানুষের কোনো কিছুই আমার অনাত্মীয় নয়। মানবতন্ত্র এবং মানুষের মাঝখানে ভাববাদী শুচিতা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নয়

পাঁচিল কি গ্যয়েটেরই ছিল না! তবে সে পাঁচিল তিনি টপকাতে পেরেছিলেন। ভাবের পাঁচিল, নীতির পাঁচিল, ভাষার পাঁচিল। প্রেম তাঁকে সাহায্য করেছিল। প্রথম বয়সে কাটারীনা এবং ফ্রীডেরিকা

থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সমাজের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও যাকে তিনি বিয়ে করলেন সেই ক্রিস্টিয়ানা,—বহুবল্লভ গ্যয়টের জীবনে এবং সাহিত্যে যে মেয়েরা অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছে তাদের অনেকেই সমাজের নীচের তলায় মানুষ। তিনি নিজেই লিখেছেন, কাটাবীনার প্রেমে পড়ে তিনি প্রথম বুঝতে শেখেন ধর্ম, নীতি, লোকাচারের ভিত্তি কত অগভীর, আবিষ্কার করেন' সমাজ কাঠামোর অন্তরালে জীবনের যত ভয়াবহ অন্ধকার সুড়ঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের ক্ষেত্রে মানব-প্রেমী হয়েও জীবনের ক্ষেত্রে বন্দী রইলেন আভিজাত্যের দুর্গে। কামনা গ্যয়টেকে সে দুর্গ থেকে টেনে বার করেছিল। তাঁর যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলো ব্যর্থ যায় নি। একধারে যেমন গ্রীক লাটিন পড়েছেন, অন্যধারে তেমন দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটিয়েছেন শুঁড়ি-খানায়, বস্তিতে, বেশ্যালয়ে, সমান আনন্দে মিশেছেন ধার্মিক লাফাটর আর মাতাল প্রকৃতিবাদী বাজেডভ্-এর সঙ্গে, বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন নেতিপন্থী মের্ক আর যুক্তিভীরু যাকোবির সঙ্গে, গরীব গেঁয়ো পুরুতের মেয়ে ফ্রিডেরিকার সঙ্গে প্রেমলীলা ফুরোতে না ফুরোতেই বন্ধুর বাগ্‌দত্তা শার্লোটে বুফ্-এর সঙ্গে জট পাকিয়েছেন।[৮] ঝড়ঝাপটা যুগের আবহাওয়াও হয়ত তাঁকে সাহায্য করেছিল। তবে আমার বিশ্বাস এই পাঁচিল টপকানোর ব্যাপারে তিনি সব চাইতে নির্ভরযোগ্য সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁর আপন প্রকৃতির মধ্যে। তাঁর যৌবন কালের বন্ধু মের্ক তাঁকে লিখেছিলেন, কাল্পনিক সৌন্দর্যের সাধনা তোমার ধর্ম নয়, বাস্তবকে উদ্ঘাটিত করার মধ্যেই তোমার সার্থকতা। গ্যয়টে সম্বন্ধে এর চাইতে সত্যকথা আর কেউ বলেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই।

---

(৮) গ্যয়টে সম্বন্ধে বাংলা ভাষার বিশেষ আলোচনা হয়নি। এক ওদুদ সাহেব যা লিখেছেন। তিনিও গ্যয়টের মূল্যায়নের চেষ্টা করেননি; তবে তাঁর বইতে ("কবিগুরু গ্যেটে" : দুই খণ্ড) গ্যয়টের জীবন এবং রচনা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য একত্রিত করা আছে। এ বইটি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

ফলত গ্যয়টে সাধনা করেছিলেন মুক্ত মন দিয়ে অস্তিত্বের সমগ্র রূপকে বুঝতে, আর সেই বোঝাকে প্রকাশ করতে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, নিজের জীবনে। 'আমি হতে চাই প্রকৃতির মত, কৃত্রিমতামুক্ত, ভালোয় মন্দয় মেশানো, সব সামাজিক ঔচিত্য বন্ধনের উর্ধ্বে'। এ তাঁর প্রথম যৌবনের ঘোষণা। বৃদ্ধ বয়সে একরমানের সঙ্গে আলাপেও বার বার তিনি সেই একই প্রত্যয়ের উল্লেখ করেছেন। 'শিল্পীকে বিমূর্ত সামান্য ভাবের মোহ এড়িয়ে দেহাশ্রিত বিশেষের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।' 'যার জীবনে মতবাদ যত প্রবল, সে তত খারাপ লেখে; বাস্তবজীবনে অভিনিবিষ্ট হতে পারলে তবেই খাঁটি লেখক হওয়া সম্ভব।' 'শ্লীলতা-বোধ সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায়—শিশুদের জন্যে বিদ্যালয়, পরিণতবয়স্কদের জন্যে রঙ্গমঞ্চ।' 'আমাব কাব্যে কখনো কোনো তত্ত্বকথাকে রূপ দেবার চেষ্টা করি নি।' 'সত্যের চাইতে কোনো কিছুই বড় নয়।' 'প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবি সত্যানুগত্য।' উগোর লেখা তাই তাঁর মনে বিতৃষ্ণার সঞ্চার করেছিল। এই মানদণ্ডে বিচার করেই তিনি গোল্ড্স্মিথ্ এবং দিদেরোকে লেখক হিসেবে অনেক উঁচুতে আসন দিয়েছেন।

গ্যয়টের এসব উক্তি যে কথার কথা নয় তাঁর দীর্ঘজীবনের রচনাবলী তারই প্রমাণ। বিশদ আলোচনার এখানে অবকাশ নেই; একটি-দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যে প্রাচীন কাহিনী থেকে গ্যয়টে তাঁর "ফাউস্ট" নাটকের গল্পটি সংগ্রহ করেন তার নায়িকা ছিল গ্রীক মহাকাব্যের বিখ্যাত রূপসী হেলেন। স্পীজ্-এর ১৫৮৭ সালে প্রকাশিত "ফাউস্ট-বুখ্"-এ আছে ফাউস্ট্স্ যাদুবিদ্যার জোরে হেলেনাকে প্রেতলোক থেকে টেনে আনে এবং তাব প্রেমে পড়ে। ফাউস্ট্ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় গল্পেও হেলেনার সঙ্গে তার প্রেমের উল্লেখ আছে। গ্যয়টে যখন প্রথম "ফাউস্ট" নাটক লিখতে শুরু করেন তখন তিনিও হেলেনাকেই নায়িকা করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বতন্ত্রী শিল্পী-প্রকৃতিই জয়ী হল। হেলেনা রূপান্তরিত হল গ্রেট্‌খেনে—যে গ্রেট্‌খেনে দেবতার অংশ কিছুই নেই—যে বেশ্যার মেয়ে, গরীব, অশিক্ষিত, নির্বোধ। পারিসের প্রেমিকাকে গ্যয়টে দেখেন নি ; কিন্তু কেট্‌খেন শ্যয়্‌ন্‌কোফ্‌ তাঁকে হাত ধরে শিখিয়েছিল কামনার মধ্যে উদ্দাম আনন্দ আর অসহ্য যন্ত্রণা কি ভাবে মেশানো থাকে ; অন্য ধারে নিষ্পাপ ফ্রীডেরিকাকে ভালবেসে ত্যাগ করার গ্লানি তিনি কোনো দিন ভুলতে পারেননি। তাঁর কল্পনা বড় জোর পৌরানিক হেলেনের ওপরেই কিছু কারিগরি করতে পারত ; তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা জন্ম দিল মার্গারেটাকে। মার্গারেটা তাই অমর হল, অন্য কেউ দূরে থাক স্বয়ং গ্যয়টেও এমন আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে "ফাউস্ট" দ্বিতীয় খণ্ডে গ্যয়টে অবশ্য হেলেনাকে নিজের অধিকারে নাটকে স্থান দিয়েছেন ; দ্বিতীয় খণ্ডের পুরো তৃতীয় অঙ্কটি হেলেনাকে নিয়ে লেখা। এখানে কাব্যগুণের অভাব নেই, যেমন নেই রবীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্যরচনায়। কিন্তু প্রথমত, হেলেনার সঙ্গে নাটকের কোনো যোগ নেই (তৃতীয় অঙ্কটি প্রথমে স্বতন্ত্র একটি রচনা হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল) ; আরিস্ট-টলের ভাষায় এটি এপিসোড মাত্র। দ্বিতীয়ত, চরিত্র হিসেবে হেলেনা একেবারেই অবাস্তব, মার্গারেটার সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। গ্যয়টে এখানে নিজের প্রকৃতিকে খর্ব করে নিজের এবং আমাদের লোকসান ঘটিয়েছেন। "ফাউস্ট" দ্বিতীয় খণ্ড তাই প্রথম খণ্ডের মত অমরত্ব অর্জন করতে পারল না।

নাটকের ক্ষেত্রে যেমন উপন্যাস এবং গল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি এই অকম্প্য জীবনস্বীকৃতি গ্যয়টের বৈশিষ্ট্য। "ভ্বের্টেরের দুঃখ" কাঁচা হাতের লেখা ; কিন্তু সেই ঝড়ঝাপটার যুগও গ্যয়টে ভাববাদের মোহে কখনো ভোলেন নি তাঁর নায়ক-নায়িকা মানুষ, সে কারণে জটিল, দ্বিধাবিভক্ত, কোনো ভাবরূপের দেহায়ন নয়। তাঁর সব চাইতে

দুঃসাহসী এবং পরিণত উপন্যাস হ্বাহ্ল্ফারহ্বান্ট্শাফ্টেন্-এ (এর সঠিক বাংলা তর্জমা কি হতে পারে ভেবে পাই নি—ইংরেজী তর্জমায় ইলেক্টিভ্ অ্যাফিনিটিজ্) এই চেতনা বিচিত্র ফসলে সার্থকতা লাভ করেছে। এ বই পড়ে বায়রন্ গ্যয়টেকে বলেছিলেন "বুড়ো শেয়াল।" রবিঠাকুর সম্বন্ধে এ কথা মুখে আনা দূরের কথা তাঁর অতি বড় শত্রুও কখনো মনে পর্যন্ত আনতে পারবেন না। কিন্তু লেখক হিসেবে তাতে লোকসানটা কার হল? ঋষি হয়ে রবিঠাকুর কি পারলেন এডুয়ার্ড, শার্লোটে অথবা ওটিলীর মত চরিত্র সৃষ্টি করতে? ঋষি হবার আগে তবু বিনোদিনী মহেন্দ্রের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। ঋষি হবার পর সে জীবনবোধ কোথায় গেল? কোথায় সেই গভীরতা, বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য, সংঘাত, প্রাণৈশ্বর্য? বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পরিণত কালের রচনার পাশাপাশি গ্যয়টের পরিণত রচনা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না ভাববাদের গণ্ডী পেরোতে পারার ফলে জার্মান লেখকের জীবনবোধ ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় বাঙালী লেখকের চাইতে অনেক বেশী সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। শুধু 'হ্বিল্হেল্ম্ মেইস্টারের শিক্ষা-নবিশী' উপন্যাসে গ্যয়টে যত বিচিত্র স্তরের এবং প্রকৃতির চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—মারিয়ানা, মেলিনা, ফিলিনা, লেয়র্টেস্, মিগ্নন্, হার্প-বাজিয়ে বুড়ো, আউরেলিয়া, জার্নো, ফেলিক্স্, লোটারিও, লিডিয়া, টেরেসা, বার্বারা, হ্বের্নর, নাটালিয়া, ফ্রীডেরিক—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাস মিলিয়েও তার তুলনা হয় না। শুধু তাই নয়, তারা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট, জটিল, জীবন্ত, পরিবর্তনশীল।

অন্যধারে অস্তিত্বের মূলে যে সংঘাত, ভালোমন্দের যে দুঃসমাধেয় সমস্যা, গ্যয়টে তাকে আদর্শ বা নীতির নামে সরল বা সহনীয় করার চেষ্টা করেন নি। মেফিস্টোর সঙ্গে চুক্তি হবার পর ফাউস্ট বলেছিল, মানুষের ভাগ্যে যত যন্ত্রণা আছে আমার অস্তিত্ব দিয়ে তার সব আমি জানব, আমার আত্মা দিয়ে ছোঁব তাদের উচ্চতম চূড়া আর নিম্নতম

গহ্বর, আমার বুকে টেনে নেব তাদের সব আনন্দ বেদনা, আমার সত্তা ছড়িয়ে যাবে তাদের সকলের সত্তায়।

Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist,
Will ich mit meinem inneren Selbst geniessen,
Mit meinem Geist das Hochst und Tiefste greifen,
Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen haufen,
Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern.

এ শুধু ফাউস্ট চরিত্রের মূল কথা নয়, 'ফাউস্ট' নাটক এবং গ্যয়টের জীবন এবং সাহিত্যসাধনারও মূলকথা। একথা যিনি বলতে পারেন তাঁর পক্ষে নিখিলেশ-সন্দীপের বিরোধকেই অস্তিত্বের চরম বিরোধ ভাবা সম্ভব নয়। তিনি জানেন যে মেফিস্টোফেলেস ফাউস্টকে বাইরে থেকে প্রলুব্ধ করে নি, ফাউস্টের সমগ্র অস্তিত্ব থেকেই তার উদ্ভব। ভালো-মন্দর বিরোধ অস্তিত্বের মূলে; সে বিরোধের যন্ত্রণা যে জানে না, অস্তিত্বের উচ্চতম শিখরও তার অনায়ত্ত। এই বোধ থেকে জন্ম নিয়েছে টাসো, ইফিগেনী, ভিল্‌হেল্‌ম্‌, ওটিলী, ফাউস্ট, মেফিস্টোফেলেস এবং মার্গারেটা। গ্যয়টে এই বোধের জোরে হোমার, বেদব্যাস, লেওনার্দো, শেক্সপীয়রের সমকক্ষ স্রষ্টা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র সে কক্ষে স্থান পাবার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে পারেন নি।

ভাষার দিক থেকেও গ্যয়টের মন শেক্সপীয়রের মত সংস্কারমুক্ত। 'ফাউস্ট' নাটকের প্রথম খসড়ার একটি বিখ্যাত চরণে তিনি লিখে-ছিলেন: বাকচাতুরী। পুতুলনাচের সঙ্গেই ওটা মানায়। (Was Vortrag! Das ist gut furs Puppenspiel)। কোমলকান্ত পদাবলীতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন; ধীরোদাত্ত ভাষাও তাঁর আয়ত্তে ছিল। কিন্তু তার জন্যে তিনি হাটবাটের ভাষাকে অবহেলা করেন নি, ভোলেন নি ইতরজনের ভাষার মধ্যেও অসামান্য ব্যঞ্জনার সম্ভাবনা নিহিত থাকে[৭]।

(৭) গ্যয়টে জন্মেছিলেন শিক্ষিত অবস্থাপন্ন পরিবারে, লেখাপড়া শিখেছিলেন লেইপ্‌ৎজীগ্‌ এবং স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, অল্প কিছুকাল আইনজীবীর কাজ করার

সব চেয়ে বড় কথা অশ্লীলতার ভয়ে তিনি কখনো ভাষাকে কৃত্রিম বা অস্বচ্ছ করে তোলেন নি। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তফাৎ কতখানি তার কিছুটা ধারণা হবে 'পূরবী' এবং 'মহুয়া'র পাশে 'রোমিশে এলেগিয়েন' পড়লে। ভাষা বিষয়ে গ্যয়টের এই মুক্তবুদ্ধির সবচাইতে সার্থক উদাহরণ 'ফাউস্ট'। এখানে তিনি শ্লীল-অশ্লীল, অভিজাত-ইতর, কোমল-রুক্ষ, বিচিত্র স্তর এবং প্রকৃতির ভাষায় যে আশ্চর্য ঐক্যতান সৃষ্টি করেছেন, শেক্সপীয়রের নাটকের বাইরে তার তুলনা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার অন্তত জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই; সে ঋণকে ছোট করে দেখানো ঘোর নির্বুদ্ধিতা। রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট হয়েছি

পর হ্বাইমার সরকারের একজন মন্ত্রী হ'ন। সুতরাং জনসাধারণের জীবন এবং ভাষা থেকে তাঁর বিচ্ছিন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা যে তিনি হ'ননি শুধু "ফাউস্ট" নাটকের ভাষা থেকেই তার বহু উদাহরণ দেখানো যায়। ইতর জনের ভাষা যে সাহিত্যে মোটেই অপাংক্তেয় নয়, সাহিত্য চর্চার প্রথম যুগেই একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। "হানস্ হ্বুর্স্টস্ হখ্‌ৎজেইট্' নামে তাঁর প্রথম যৌবনের রচনা অসমাপ্ত ব্যঙ্গকাব্যটি প্রায় আগাগোড়াই খিস্তির ভাষায় লেখা। এটির সাহিত্যগুণ খুব বেশী নয় সত্যি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে গ্যয়টে যখন এটি লিখছেন ঠিক তখনি তার পাশাপাশি সুরু করেছেন "ফাউস্ট" প্রথম খণ্ডের খসড়া। টমাস মান দেখিয়েছেন, পরিণত অবস্থায়ও "ফাউস্টের" ভাষার মধ্যে বহু জায়গায় "হান্স্"-এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "হানসের বিয়ে" কাঁচা লেখা কিন্তু তার কাহিনী এবং ভাষার মধ্যে কবি যে সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন সেটিকে বাঁচিয়ে না রাখতে পারলে "ফাউস্ট" কোনো দিনই লেখা সম্ভব হ'তনা। এই সংস্কারমুক্ত মনোভাব গ্যয়টে শেষদিন পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন; প্রমাণ "হ্বাল্‌ফারহ্বানুটশীকটেন-"এর কাহিনী, চুয়াত্তর বছর বয়সে উলরিকার প্রেমে পড়ে লেখা "মারীনবাড" গাথা; তার জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত "রোজনামচা" নামে দীর্ঘ কবিতা। শেষোক্ত রচনাটিতে ঋতুসংহার এবং মোহমুদ্গার যেন হাত ধারাধরি করে দাঁড়িয়েছে। "বুড়ো শেয়াল"ই বটে!

বলেই আজ আমরা বিশ্বভূমিকায় তাঁকে বিচার করার কথা ভাবতে পারি। অসামান্য সৃজনশক্তি এবং মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়েও তিনি যদি গ্যয়টে এবং শেক্সপীয়রের পর্যায়ে না পৌঁছতে পেরে থাকেন, তবে তার জন্য তিনি যতখানি দায়ী এদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তার চাইতে কম দায়ী নয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সে পরিবেশের রূপান্তর যে কত প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মহৎ ব্যর্থতার দ্বারা তা প্রমাণ করে গেলেন। কৃতজ্ঞতাজাত ভক্তির আতিশয্যে সে কথা যদি আমরা না বুঝতে পারি তবে তাঁর দাক্ষিণ্যের ঋণ কি করে শুধব ?

কবিতার কান

গান শুনতে কান লাগে একথা সকলেই মানেন, কিন্তু কান ছাড়া যে কবিতাও পড়া যায় না এটা হয়ত অনেকে জানেন না। সত্যিকথা বলতে কি এযুগে বেশীর ভাগ পাঠক কবিতা পড়েন চোখ দিয়ে। ফলে এমনতর অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে আধুনিক কবিতার দৌড় চোখ ধাঁধানো পর্যন্ত, মনকাড়া নাকি তার নাগালের বাইরে। আমার বিশ্বাস এ অভিযোগে যেটুকু সত্য আছে তা বিচার করলে দেখা যাবে যে কাব্যসৃষ্টি এবং কাব্যসম্ভোগের মাঝখানে এ ব্যবধানের জন্য আধুনিক কবিদের উঁচ্ কপালেপনা যতটা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী আধুনিক পাঠকদের কাব্যানুভূতির (এবং বিশেষ করে শ্রবণেন্দ্রিয়ের) অপরিণতি। অথবা আরো সাফ ভাষায় বলতে গেলে, তাঁদের মনের জড়তা এবং কানের স্থূলতা।

কবিতার—অথবা কাব্যসম্ভোগের—স্বর্ণযুগে কাব্যরসিকেরা কবিতা চোখ দিয়ে পড়তেন না, কান দিয়ে শুনতেন। সভ্যতার আদিকালে, সমাজে যখন শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের ভেদ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, সাহিত্যের একটি মাত্র রূপ ছিল—সে-রূপ কবিতার। কি ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, কি গোষ্ঠীগত অভীপ্সা অভিজ্ঞতা, কি গল্পকাহিনী, কি আদিম দর্শন নীতিচিন্তা, সবকিছুই রচিত হ'ত ছন্দোবদ্ধ ভাষায়, প্রচারিত, রক্ষিত এবং পুরুষ থেকে পুরুষের স্মৃতিতে সঞ্চারিত হ'ত কান থেকে কানে। ক্রমে সমাজজীবন জটিলতর হ'ল, শ্রমবিভাগকে আশ্রয় করে এল শ্রেণী, বর্ণ, উপবর্ণের বিচিত্র ভেদাভেদ, জীবনের জটিলতাকে ভাষায় উপযোগী রূপ দেবার জন্য গড়ে উঠল গদ্যসাহিত্য। কিন্তু তখনো কবি এবং সাধারণ পাঠকের মধ্যে কোনো দুস্তর ব্যবধান দেখা দেয় নি। অবশ্য একথা ঠিক যে ইতিমধ্যে উচ্চতর এবং নিম্নতর বর্ণদের মধ্যে গভীর

এবং ব্যাপক প্রভেদ পরিস্ফুট হয়ে ওঠার ফলে কবিতার আদিম কৌম আবেদন অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। ফলে রামায়ণ মহাভারত কি ইলিয়াড ওডিসীর মত মহাকাব্য-সঙ্কলন আর দেখা দিচ্ছে না। রাজা এবং জ্ঞানীগুণী অভিজাতমণ্ডলীর জন্য যে সব কাব্য রচিত হচ্ছে তা সম্ভোগে ইতরজনের না আছে অধিকার না আছে সামর্থ্য। অপর পক্ষে ইতরজনের ভিতর থেকে উদ্ভূত কবিতা বিদগ্ধজনদের নজরে পৌঁছচ্ছে না, পৌঁছলেও তার কপালে জুটছে পরিহাস, বড় জোর ঔদাস্যভরা পিঠথাবড়ানি। তবু সেযুগেও কবিরা নিশ্চিত করে জানতেন তাঁদের কাব্যের নির্দিষ্ট সম্ভোক্তা কারা; হাটের কবি প্রত্যক্ষভাবে চিনতেন তাঁর হাটকে, দরবারের কবি প্রত্যক্ষভাবে জানতেন তাঁর দরবারকে। কাব্য রচনা করার পর কবিকে ক্বচিৎ ভাবতে বসতে হ'ত এ কবিতা কার জন্য, ক্বচিৎ সান্ত্বনা পেতে হ'ত বিপুলা পৃথিবী এবং নিরবধি কালের কথা স্মরণ করে। সৎ কাব্যের পক্ষে সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদন অপেক্ষাকৃত অনেক সহজসাধ্য ছিল। কবি এবং তাঁর পাঠকের মধ্যে শুধু লেনদেন ছিল না, ছিল স্বীকৃত, সহজ আত্মীয়তা।

মধ্যযুগ পর্যন্ত কবি-পাঠকে মোটামুটি এই অন্তরঙ্গতা দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যেও যে নিঃসঙ্গ পাঠকসখ্যচ্যুত কবি একেবারে নেই তা নয়, তবে তাঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু আধুনিক কালে এই ব্যতিক্রমই ক্রমে সাধারণ সত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য আধুনিক যুগ সর্বত্র এক সময়ে আসে নি। তা যদি আসত তবে আজ এক দেশ এবং আরেক দেশ, এক সমাজ এবং আরেক সমাজের মধ্যে আর্থিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার যে বৈষম্য, গভীর বিরোধ এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে, তা হয়ত দেখা দিত না। আধুনিক যুগ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছে। কোথাও-বা তা এসেছে আভ্যন্তরীণ বিবর্তনের ধারাবাহী হয়ে, কোথাও-

যা বাইরে থেকে আসা প্রভাবের চাপে। কিন্তু যেভাবেই আসুক না কেন, আধুনিকতার কয়েকটি মূল লক্ষণ সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক— যেমন বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি এবং ব্যাপক প্রয়োগ, সমাজের নগরকেন্দ্রী হয়ে ওঠা, যন্ত্রশিল্পের প্রসার, বিনিময় এবং মূল্যনির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে টাকার প্রতিপত্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভব ও বিকাশ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংগঠন প্রভৃতি। কোথাও-বা এই রূপান্তর একটি সুস্পষ্ট সমগ্র সমাজঐতিহ্যে পরিণতি লাভ করেছে; কিন্তু বহুদেশেই আজও আধুনিক সভ্যতার বহুমুখী সম্ভাবনা সার্থকায়িত হয়ে ওঠে নি।

আধুনিক যুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণকাহিনী লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কাব্যসম্ভোগের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগ যে বিশিষ্ট এবং বিচিত্র প্রভাব ফেলেছে তারি শুধু একটি দিক এ প্রবন্ধের আলোচ্য। এ যুগের কবিতা যে আগের দিনের মত সহজেই সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী হতে পারছে না তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে চোখে পড়ে যে আধুনিক সভ্যতার এমন কতকগুলো লক্ষণ আছে যা স্পষ্টত কবি এবং পাঠকের মধ্যে আত্মীয়তা ঘটানোর পক্ষে প্রতিকূল। এ প্রবন্ধে শুধু তার একটি লক্ষণ নিয়েই আলোচনা করব।

প্রাগাধুনিক যুগে কবিরা তাঁদের কবিতা পাঁচজনের মধ্যে বসে পড়ে শোনাতেন। সে পাঁচজন হয়ত বিদগ্ধ অভিজাত শ্রোতাও হতে পারেন, আবার সরল দরিদ্র গ্রামবাসীজনও হতে পারেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার কথা সকলেই জানেন; শোনা যায় প্রাচীন রোমে স্বল্পখ্যাত কবিরা তাঁদের আপন আপন রচনা নিজে রাজপথের পার্শ্ববর্তী প্রাচীরে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে পথিকজনদের শোনাতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না; আর এই সেদিনও এদেশে আঙ্গিনায় বসে পাঁচালী পড়ার পাঠ ছিল। মোদ্দা প্রাগাধুনিক যুগে কবিতা পড়া আর কবিতা শোনার মধ্য দিয়ে কবি আর তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম

শরীরী সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। এল আধুনিক যুগ, উদ্ভব হ'ল ছাপাখানার, কোনো সাহিত্যরচনা আর একত্রে পাঁচজনের বসে শোনার প্রয়োজন রইল না। ছাপার হরফে তা হাজির হ'ল আলাদা আলাদা ভাবে প্রতি পাঠকের হাতের গোড়ায়। সাহিত্যসম্ভোগের মাধ্যম হিসেবে কানের চাকরী গেল, তার জায়গা দখল করে বসল চোখ। কবির আর দায় রইল না গলা মাজবার, পাঠকের কোনো দরকার রইল;না কান সাধবার। কবি পর্যবসিত হলেন লেখকে, আর কাব্যভোক্তা পাঠকে। ছাপার হরফ কবির লেখাকে অনেক বেশী লোকের দৃষ্টিগোচর কবল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা কবি এবং কাব্যানু-রাগীদের মাঝখানে ক্রমবর্ধমান অন্তবাল গড়ে তুলল।

অবশ্য এতে গদ্যসাহিত্যের কোন ক্ষতি হয় নি, বরং প্রভূত লাভই ঘটেছে। আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি এবং সম্প্রসারণে তার প্রমাণ মিলবে। কিন্তু এর ফলে কবিতা একদিক থেকে ভারি মার খেল।* ছাপার হরফকে মাধ্যম করার ফলে সাধারণ লোকের কাছে কবিতার আবেদন অনেকখানি কমে গেল ; আর তার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যো-পভোগীদের সংখ্যা এল কমে। গদ্যের আবেদন মুখ্যত বাক্যার্থনির্ভর। শব্দ এবং বাক্যের অর্থ জানা থাকলে যে-কোন ভাষার গদ্য রচনা পড়তে আর বিশেষ কোনো বাধা নেই। কিন্তু কবিতায় শব্দের আবেদন একই সঙ্গে দুমুখা। তার অর্থ যেমন পাঠকের বুদ্ধিকে ব্যাপৃত রাখছে, তার ধ্বনি তেমনি পাঠকের ইন্দ্রিয়ে ঝঙ্কার তুলছে। (ধ্বনি কথাটিকে এখানে অলংকারশাস্ত্রের ব্যঞ্জনা অর্থে ব্যবহার করছি না—স্ফোট, আওয়াজ,

* তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের কিছু সদাত্মক দান নেই। সমাজ থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে কবিরা অনেক বেশী আত্মসচেতন হয়েছেন। ফলে কাব্যব্যঞ্জনায় আগের থেকে অনেক বেশী সূক্ষ্মতা, জটিলতা এবং বৈচিত্র্য এসেছে। কিন্তু সে কাব্যের সম্ভোক্তারা যে বিরলতর হয়ে এসেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

রব বা sound অর্থে ব্যবহার করছি।) ফলে গদ্যের চেয়ে কবিতায় শব্দের প্রয়োগ অনেক বেশী জটিল, কারণ এখানে শব্দ একাধারে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর। গদ্যে শব্দ একান্তভাবেই অর্থের বাহন; এমন কি যেখানে বাক্য প্রয়োগকৌশলে ব্যঞ্জনাপ্রধান, সেখানেও সে ব্যঞ্জনা মুখ্যত শব্দার্থ আশ্রয় করে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু কাব্যসম্ভোগে শব্দের অর্থগত এবং ধ্বনিগত আবেদন তুল্যমূল্য; অর্থ এবং ছন্দের নিগূঢ় সামঞ্জস্য না ঘটলে কাব্যব্যঞ্জনা অসম্ভব। গদ্যে শব্দ অর্থপ্রকাশের উপায় মাত্র; কাব্যে শব্দ একই সঙ্গে উপায় এবং উদ্দেশ্য দুই-ই বটে। এই কারণে মালার্মে বলেছেন কবিতা মাত্রেরই অভীপ্সা সঙ্গীতাভিমুখী। তবে কবিতা সঙ্গীত নয়, কেননা সঙ্গীতে ধ্বনিই প্রধান, এমন কি অর্থকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে শুধু ধ্বনিকে আশ্রয় করে বিশুদ্ধ সঙ্গীত রচিত হতে পাবে। কবিতার পক্ষে এজাতীয় বিশুদ্ধতা অসম্ভব। কবিতার শব্দ যেন বৈষ্ণব কাব্যের রাধিকা; ধ্বনির মুরলী তার চিত্তকে উতলা করলেও অর্থের কূল ছেড়ে যাবার কোনও উপায় নেই। কবিতার একপ্রান্তে সঙ্গীত আর অন্য প্রান্তে গদ্য। যে কোনো ভাষায় কাব্যরূপের ইতিহাস এ দু'য়ের টানাপোড়েনে গড়া। এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে কি কাব্যসৃষ্টি আর কি কাব্যসম্ভোগ দুই-ই অসম্ভব। আধুনিক কালে ছাপার দৌলতে কাব্যের সঙ্গীতমুখী দিকটির কথা পাঠকেরা ক্রমে ভুলতে বসেছেন। ফলে তাঁদের কাব্যসম্ভোগের ক্ষমতাও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় সমকালীন সৎ কবিতাও যদি তাঁদের মন ভরতে না পারে, তবে তাতে আশ্চর্য ঠেকাটাই আশ্চর্য।

দুই

কাব্যরূপে শব্দের ধ্বনিগত মূল্য প্রধানত তিনটি স্তরে লক্ষ্য করা যায়: প্রথমত অক্ষরধ্বনির, দ্বিতীয়ত ধ্বনিগুচ্ছের এবং তৃতীয়ত ধ্বনিতরঙ্গের। কাব্যসম্ভোগে এই স্তর তিনটি অবশ্য স্বতন্ত্র থাকে না,

পরস্পরে অনুস্যূত হয়ে একটি সমগ্র অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। তবে সম্ভোগের জন্য কানের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে তাদের পৃথক করে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, উচ্চারণ করা এবং কানে শোনার দিক থেকে প্রতিটি অক্ষরচিহ্নিত ধ্বনি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। দ্বিতীয়ত, এই অক্ষর-ধ্বনিরা যখন গুচ্ছগুচ্ছ ভাবে প্রথমে শব্দে এবং শব্দেরা যখন কাব্যপংক্তিতে সন্নিবিষ্ট হয় তখন আবার তারা কানের মারফৎ মনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভাবের উদয় ঘটায়। দান্তে তাই ধ্বনির দিক থেকে শব্দের নানা রকম জাতিবিভাগ করেছেন। কোনো শব্দ বা কর্কশ কোনটি মসৃণ, কোনটি কঠিন, কোনটি কোমল, কোনটি গম্ভীর কোনটি লঘু, কোনটি মন্থর কোনটি দ্রুত। যেমন ধরুন "ল" ধ্বনিবহুল পদ স্বভাবত লঘুতা, কোমলতা এবং তারল্যের ভাব উদ্রেক করে। আবার "ধ" বা "ভ" ধ্বনির সঙ্গে গাম্ভীর্য এবং মন্থরতার ভাব জড়িত। "ট" এবং "র" ধ্বনি যুক্ত হলে কঠিনতা বা কর্কশতার সঙ্গে দ্রুতগতির আভাস মেশে। এগুলো অবশ্য অত্যন্ত স্থূল এবং প্রাথমিক প্রভেদ; কাব্য-দেহে কোন বিশুদ্ধ ধ্বনিই প্রকট হয়ে দেখা দেয় না, দিলে তা কাব্য-সম্ভোগ ব্যাহত করে। কিন্তু বিভিন্ন ধ্বনির সঙ্গমে যে বিচিত্র ধ্বনি-সুষমার উদ্ভব হয় তার সমগ্র আবেদন এই সব ধ্বনি-উপাদানের চরিত্র দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। দুটি অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রামাণিক উদাহরণ ধরা যাক।

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জ-কুটিরে॥
(জয়দেব ঃ গীতগোবিন্দম্॥)

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব
প্রদীপম॥
(কালিদাস ঃ কুমারসম্ভবম্॥)

যাঁরা সংস্কৃত রচনা পড়ে মানে বুঝতে পারেন না তাঁরাও যদি এ শ্লোক দুটি ভাল আবৃত্তিকারের মুখে শোনেন তবে শব্দার্থ না জেনেও অনুভব করবেন যে প্রথমটি একটি লঘু এবং কোমল ভাব প্রকাশ করছে এবং দ্বিতীয়টির উপজীব্য হল একটি গম্ভীর উদাত্ত কল্পনা। একই কবিতার মধ্যে ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে পদের ধ্বনিগত চরিত্রেও যে গভীর রূপান্তর আসে তার অজস্র উদাহরণ মিলবে কুমারসম্ভব কাব্যে। ধরুন তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের বর্ণনায় "রাগেণ বালারুণকোমলেন চূতপ্রবালোষ্ঠমলংচকার" ইত্যাদি ললিত পংক্তির পরেই ধ্যানস্থ ত্র্যম্বকের ছবি আঁকতে গিয়ে কবি কী নিপুণতার সঙ্গে ধ্বনিসংগতের উপাদান পাল্টেছেন—

পর্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে॥

আবার যেই উমা প্রবেশ করলেন ধ্বনির চরিত্র বদলে গেল :

পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

শুধু তাই নয়, ঐ সর্গের শেষ অংশে মদনভস্মের বর্ণনায় কোমল মন্থর ধ্বনিসমাবেশ অকস্মাৎ ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন প্রবল ক্ষিপ্রতায় রূপান্তরিত হয়েছে। "বিবৃন্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পৈঃ" ইত্যাদি পংক্তির মোলায়েম সুখাবিষ্ট ধ্বনির পর যখন হঠাৎ শুনি :

তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যো ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥

তখন আমাদের স্নায়ু অপ্রত্যাশিত আঘাতে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

কিন্তু ধ্বনি সংগঠনের এই প্রত্যক্ষ আবেদন ছাড়াও কাব্যসম্ভোগে

ধ্বনির আর একটি নিগূঢ় এবং সূক্ষ্ম অংশ আছে। সেই অংশের বাহক হ'ল ছন্দ। ছন্দের সত্তা অবশ্য ধ্বনির সঙ্গে এক নয়। সব শিল্প-রূপেরই প্রাণ হ'ল ছন্দ, তবে বিভিন্ন শিল্পরূপে তা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। রূপের পরিমিতির সঙ্গে প্রাণের অনির্দেশ্যতার সঙ্গমের ফলে ছন্দের জন্ম। যেখানে বিশুদ্ধ নিয়মানুগত্য প্রাণের টুঁটি টিপে ধরে সেখানে রূপের মধ্যে ছন্দের সঞ্চার ঘটে না। আবার যেখানে প্রাণের গতি সৌষম্যের নির্দেশকে পুরোপুরি খারিজ করে বসে, সেখানে ছন্দ গড়ে ওঠারই অবকাশ পায় না। ছন্দ যে আমাদের অস্তিত্বে পুলক আনে তার কারণ ছন্দে প্রাণের স্বাদ আছে; অপর পক্ষে ছন্দ আমাদের অনুভূতি শক্তিকে মার্জিত এবং সূক্ষ্মতর করে তোলে তার কারণ ছন্দের সুমিতি নিয়মনির্ভর। পরিমিতি যদি প্রাণকে দেয় রূপ, তবে প্রাণ পরিমিতিকে দেয় ব্যঞ্জনা। ছন্দের মধ্যে প্রাণ এবং পরিমিতির বিরোধ দাম্পত্যে রূপান্তরিত হয়। যে শিল্পকর্মে এ রূপান্তর ঘটে নি তার দশা সেই পরিবারের মত যেখানে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে শুধু সামাজিক সম্পর্কই স্থাপিত হয়েছে, দেহ-মনের মিলন হয় নি।

আগেই বলেছি বিভিন্ন শিল্পরূপে ছন্দ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। ছবিতে তার মুখ্য আশ্রয় রেখা, তেমনি কবিতায় তার মুখ্য আশ্রয় ধ্বনি। স্বতন্ত্র ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ নয়, ধ্বনিতরঙ্গ। ধ্বনিগুচ্ছের নিজস্ব আবেদন ছাড়াও ধ্বনিতরঙ্গের আলাদা আবেদন আছে—এ আবেদন শুধু বিশেষ একটি ইন্দ্রিয়ের কাছে নয়, ভোক্তার সমগ্র অস্তিত্বে। কবিতার প্রতি চরণের ধ্বনিসমষ্টি একটি সমগ্র রূপের মধ্যে আধৃত, এই রূপ একই সঙ্গে নিয়মনিয়ন্ত্রিত এবং প্রাণচঞ্চল। প্রতি চরণের এই সমগ্র রূপটির আত্মা হ'ল ছন্দ। ভাষার বিভিন্নতা অনুসারে ধ্বনিতরঙ্গ কোথাও-বা অক্ষর, কোথাও-বা ঝোঁক (accent), কোথাও-বা পর্বের ওপরে নির্ভর করে। এই ধ্বনিতরঙ্গ বা কাব্যছন্দের মধ্যে একধারে যেমন কবির সৃজনাভিজ্ঞতা-সঞ্জাত আবেগ মূর্ত হয়ে ওঠে, অন্যধারে তেমনি এরই

মাধ্যমে সে আবেগ ভোক্তার অস্তিত্বে সঞ্চারিত হয়। শুধু বাক্যার্থের মাধ্যমে এজাতীয় আবেগ-সঞ্চারণ প্রায় অসম্ভব।

ছন্দ যে শুধু কবি-মন থেকে পাঠক-মনে শিল্প-আবেগের (aesthetic emotion) সঞ্চার ঘটায় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাক্যার্থের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকেও ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। ভাষার ব্যঞ্জনা অবশ্যই প্রধানত বাক্যার্থনির্ভর; কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার বিকাশে ধ্বনিগুচ্ছ এবং ধ্বনিতরঙ্গেরও একটা প্রধান অংশ আছে। ফরাসী প্রতাকবাদী কবিরা ধ্বনি এবং ছন্দের এই গূঢ় ব্যঞ্জনাসামর্থ্য বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত করে গেছেন। ধ্বনিগুচ্ছের কথা আগে বলেছি, ছন্দ যে কি গভীরভাবে ব্যঞ্জনার স্ফুরণে অংশ নিয়ে থাকে তার দু'একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

তোমাকে চাই আমি, তোমাকে চাই
তোমাকে ছাড়া নেই, শান্তি নেই;
রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী রাত্রিদিন।

রভসে দাউ দাউ সমুদ্রের
শরীরে পাকেপাকে ফস্‌ফরাস্;
অন্ধকারে চুল এলিয়ে দাও
নখরে নীল হোক শুভ্রবুক।

(অরুণকুমার সরকার: দূরের আকাশ।)

চ'লে এলুম, তোমায় ছেড়ে চ'লে এলুম।
সখী আমার হারানো দিন ভালোবাসার ভীরু আশার,
তবু তোমায় ছেড়ে এলুম ছেড়ে এলুম।

(মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়: মেঘ বৃষ্টি ঝড়।)

নোনা সমুদ্রে কত ঢেউ, কত
ঢেউ বঙ্গোপসাগরে, কী ঢেউ
মেঘনায় নীল পদ্মায় পলিরঙ্, গঙ্গায় গেরুয়া—যে ঢেউ
নর্মদা বাহুবন্ধে সিন্ধু
আঙুলে পাঁচটি আঙুলে, সে ঢেউ......
(মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ঃ মেঘ বৃষ্টি ঝড়।)

এ তিনটি ক্ষেত্রেই বাচ্যার্থের সঙ্গে ছন্দের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে আর সেই মিলন থেকে জন্ম নিয়েছে প্রত্যেকটির বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা। অরুণকুমারের কবিতাটিতে সাত (তিন+চার)/পাঁচ (তিন+দুই) এর ওঠা-পড়া এবং তারই মাঝে মাঝে যুক্ত স্বর এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনি-সঙ্কোচ শ্রোতার রক্তে যে প্রবল বিক্ষোভ এবং উল্লাসের ঢেউ তোলে, শুধু তারই মাধ্যমেই এ কবিতার বাক্যব্যঞ্জনা পাঠকের মনে সঞ্চারিত হতে পারে। মঙ্গলাচরণের প্রথম কবিতাটিতে পাঁচধ্বনির ছন্দতরঙ্গ (প্রত্যেক পাঁচে নিয়মিতভাবে একটি হসন্তের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়) এবং দ্বিতীয়টিতে ছয় ধ্বনির ছন্দতরঙ্গ (এখানে স্বরবর্ণ এবং হসন্তের প্রয়োগ আরো সূক্ষ্ম.) ঐ একই গূঢ় নিয়মে কবিতা দুটির স্বতন্ত্র বাক্যার্থকে ব্যঞ্জিত করছে। কবিতা তিনটির ধ্বনিতরঙ্গ বাদ দিন, শুধু ব্যক্যার্থের খোসা পড়ে থাকবে, কবিতা থাকবে না।

ছন্দের এই নিগূঢ় ব্যঞ্জনাসামর্থ্যের প্রমাণ হিসেবে যে কোনো ভাষার অধিকাংশ সৎকবিতাকেই উপস্থিত করা চলে। ক্ষমতাবান শিল্পীদের কাব্যে অনেক সময়ে একই কবিতার মধ্যে ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যায়—উভয় পরিবর্তনের সূত্রই অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাবৈচিত্র্যের মধ্যে অনুস্যূত। পাউণ্ডের ক্যাণ্টোস্ এবং এলিয়টের ওয়েস্ট্‌ল্যাণ্ড্ কাব্যে এ জাতীয় পরিবর্তনের বহু সার্থক উদাহরণ ছড়ানো আছে। একটি বিশেষ করে মনে পড়ছে। ওয়েস্ট্-

ল্যাণ্ডের পঞ্চম সর্গে ৩৩১ পংক্তি থেকে ৩৪৫ পংক্তি পর্যন্ত কবি বর্ণনা করেছেন, পাথুরে দেশে জল নেই, বৃষ্টি নেই, নৈঃশব্দ্য পর্যন্ত নেই, আছে শুধু পা-ডোবানো বালি, উত্তাপ, ঘুরে ঘুরে ওঠা পাহাড়ে পথ আর সেই মরা পাহাড়ে নির্জলা নিস্ফলা বজ্র গর্জনের প্রতিধ্বনি।

There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From doors of mudcracked houses

তারপর এই পটভূমিতে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন জলের জন্যে তৃষ্ণার্ত যাত্রীর হতোদ্যম দুঃসহ পিপাসা। সঙ্গে সঙ্গে ছন্দও কি আশ্চর্যভাবে বদলেছে।

If there were water

And no rock
If there were rock
And also water
And water
A spring
A pool among the rock
If there were the sound of water only
Not the cicada
And dry grass singing
But sound of water over a rock
Where the hermit-thrush sings in the pine trees
Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water

যাঁরা সামান্য ইংরেজি জানেন তাঁরাও পূর্বের পংক্তিগুলির পরে এ অংশটুকুর আবৃত্তি শুনলে অনুভব করবেন তৃষ্ণার আর্তি এখানে চরমে পৌঁচেছে—পিপাসার্তের আর দম নেই, বালিতে পাথরে হোঁচট খেতে খেতে পড়তে পড়তে সে চলেছে, মন্ত্রের মত একটি আর্ত আকাঙ্ক্ষা ঘুরে ঘুরে তার চৈতন্যকে আবিষ্ট করছে—শেষ বারের মত সে আর্তি একটি স্বপ্নে সম্প্রসারিত হল—drip drop drip drop drop drop

drop—আর তারপর সে স্বপ্ন মুছে দিয়ে, যাত্রীর সমগ্র অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে নেমে এল অমের ক্লান্তি এবং অনতিক্রম্য নিরাশ্বাস :

But there is no water

তিন

আমাদের দেশের সঙ্গীতশাস্ত্রীবা বলেছেন প্রতি রাগ-রাগিণীর নাকি নিজস্ব একটি রূপ আছে এবং এদেশের চিত্রশিল্পীরাও সেসব কল্পিত রূপ রঙে রেখায় এঁকে গেছেন। হাইনে এবং তাঁর পরে ফরাসী প্রতীক-বাদীরা কান এবং চোখের এই নিগূঢ় পরস্পরনির্ভরতার কথা আমাদের ভুলতে নিষেধ করেছেন। সুস্পষ্ট চিত্ররূপের কথাটা হয়ত বাড়াবাড়ি, কিন্তু ধ্বনিতরঙ্গ থেকে চিত্ররূপের আভাস যে কল্পনায় সঞ্চারিত হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্ততঃ কবিতার ক্ষেত্রে এ তত্ত্বের বিস্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

এলিয়টের ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড্, পঞ্চমসর্গ, থেকেই উদাহরণ নেওয়া যাক।

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water

এখানে যে শব্দচিত্রটি উপস্থিত করা হয়েছে সেটি হ'ল ঘুরে ঘুরে ওঠা পাহাড়ে রাস্তার। সে ছবিটি কি বাক্যার্থের চাইতে ছন্দ বা ধ্বনিতরঙ্গের মারফৎ আমাদের কল্পনায় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে না? প্রথম চরণ যে ধ্বনিতে শেষ পরের চরণে সেই ধ্বনিকে গোড়ার দিকে এনে, প্রথম চরণে দুটি মুখ্য ধ্বনিগুচ্ছ (ওয়াটার এবং রক) যে পরম্পর্যায় অবস্থিত পরের চরণে তাদের বিপরীত পারম্পর্যে ব্যবহার করে, সূচনার মুখ্য ধ্বনিকে শেষ চরণের অন্তে পুনরাবৃত্তি করে, এবং ওয়াটার, ওয়াইন্ডিং, মাউন্টেন ও উইদাউটে যুক্তস্বরের প্রয়োগ ঘটিয়ে

কবি ওয়াইনডিং রোডের ছবিটিকে ধ্বনির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হাল্কা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো।
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার॥
(বিষ্ণু দে : চোরাবালি)

ধ্বনিবিন্যাস এবং ছন্দের গূঢ় সমর্থনে সংহত গ্লেসিয়ার ও ধাবমান অশ্বারোহীর ছবি দুটিই শুধু এখানে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে নি; সে ছবি দুটি যে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রতীক তা পর্যন্ত আমাদের হৃদয়সংবাদী হতে পারছে এই ধ্বনিব্যঞ্জনাকে আশ্রয় করে।

জেরার্ড ম্যান্‌লি হপ্‌কিন্সের কবিতা এজাতীয় ধ্বনিচিত্রের জন্যে বিখ্যাত। এক তাঁর "দি লেডন্ একো অ্যাণ্ড দি গোল্ডন্ একো" কবিতাটি থেকেই একাধিক উদাহরণ উদ্ধার করা চলে।

O´ is there no frowning of these wrinkles, rankèd wrinkles deep,
Do´wn ? no waving off of these most mournful messengers,
still messengers, sad and stealing messengers of grey ?

প্রথমে বিচিত্র সমাবেশে "র" ধ্বনির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ জরার অমসৃণ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছে; তারপর "ডীপ ডাউন্"-এ পাচ্ছি ব্যর্থকাম গুরুভার প্রয়াসের ইঙ্গিত; তারপর ওয়েভিং এর "ভ", অফ্‌এর নরম "ফ" এবং পরের অফ্‌এর কঠিন "ফ" যেন এক শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস; পরিশেষে অন্তে, মধ্যে এবং সূচনায় "স" ধ্বনির অনুপ্রাসে এবং স্টিল ও স্টীলিং এর হ্রস্ব এবং দীর্ঘ স্বরে জরার কায়াহীন দূতদের বিষণ্ণ সশঙ্ক পা-টিপেটিপে ফিসফাস চলাফেরার ছবি স্পষ্ট।

ব্যদ্‌লেয়ারের কবিতায় বহু শব্দচিত্র এমনি ধ্বনি-অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ। L'Albatros কবিতাটি থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। মাঝে

মাঝে জাহাজের সারেঙ্‌রা মজা দেখার জন্যে আল্‌বাত্রোস্‌ পাখীদের ধরে পাটাতনের ওপরে ছেড়ে দেয়। বেচারীদের তখন সে কি দশা। যারা ছিল আকাশের রাজা, বিরাট ডানা মেলে সমুদ্র পারাপার করত, তারা যখন সেই ডানা টেনে টেনে একপা একপা করে টলে টলে ডেকের ওপরে হাঁটার চেষ্টা করে, তখন তাদের কি বেঢপ আর বিশ্রীই না দেখায়! সারেঙ্‌দের কেউবা তাদের ঠোঁটে খোঁচা দিয়ে তামাশা দেখে,, কেউবা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে তাদের নড়বড়ে চলাকে ভেঙায়। ব্যদ্‌লেয়ার এই সমুদ্রশকুনদের সঙ্গে কবির তুলনা করেছেন। কবি যেন মেঘলোকের রাজপুত্র, ঝড়ে সওয়ার হয়ে সে ব্যাধকে তুড়ি মারে। কিন্তু পৃথিবীতে জনতার কোলাহলে নির্বাসিত হয়ে তারও দশা আল্‌বাত্রোসের মত: এখানে তার বিরাট পাখা মেলার যায়গা নেই। আলবাত্রোসের সেই বন্দী দশা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
> Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
> L'un agace son bec avec un brule-gueule,
> L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !

চারটি চরণের মধ্যে কবি এখানে এক আশ্চর্য ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সে ছবি যে জটিল অভিজ্ঞতার ধারক, তার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে শুধু চরণগুলির বাচ্যার্থ জানাই যথেষ্ট নয়, তাদের ধ্বনিগত ব্যঞ্জনায় সাড়া দেবার সামর্থ্যও থাকা চাই। Voyageur aile-র পাশে gauche, naguere si beau-র পাশে comique, infirme qui volait-এর ঠিক আগে boitant, এবং বিশেষ করে তৃতীয় চরণে brule-gueule ধ্বনিপুঞ্জ—বিরুদ্ধ ধ্বনির এই সংঘাততরঙ্গের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে এই কবিতাটির এবং সাধারণভাবে ব্যদলেয়ারের পরিণত জীবনের যেটি কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা সেটি শ্রোতার অস্তিত্বে সঞ্চারিত

হচ্ছে। ব্যদলেয়ারের জীবনে সুন্দর এবং কুৎসিৎ, করুণ এবং বীভৎস, দুঃসাহস এবং ভয়, মেঘলোকের সওদাগরী আর গণিকার কাছ থেকে পাওয়া ব্যাধি আর্ত সত্তার রসায়নে জারিত হয়ে তুলনাহীন শিল্পরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। উদ্ধৃত চরণকটির ধ্বনিরূপের মধ্যে সেই আশ্চর্য রসায়নের স্বাক্ষর বর্তমান।

শব্দের ধ্বনিগত আবেদন তার বাচ্যার্থগত ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে এবং তার নিহিত ব্যঞ্জনাকে পাঠক মনে সঞ্চারিত করে দিতে কিভাবে সাহায্য করে তার অজস্র উদাহরণ যে কোনো ভাষার বিদগ্ধ কবিদের রচনা থেকে সঙ্কলন করা যায়। বাংলা ভাষায় ভারতচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং সম্প্রতিকালে বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এর বহু সার্থক উদাহরণ আছে। অমিয় চক্রবর্তীর "সঙ্গৎ" কবিতাটি উপভোগ করতে হলে যতটা নির্ভব করতে হয় অভিধানের ওপরে তার চাইতে বেশী নির্ভর করতে হয় কানের ওপরে।

বাঁ পাশে গলির গিজ্‌গিজে ডুব
নীল টালি গম্বুজের ফালি
গ'লে গেছে দুপুরের হাওয়ায় ঝিল্‌মিল্‌
ডুব ডুব ডুব
ক্ষ্যাপা কি ফকিব কি দুই কিছুই ডুব
মূলতানের বাজারে বাজায় ঢোলক ডুব ডুব

এখানে ছবি এবং ব্যঞ্জনার ধ্বনি-নির্ভরতা এতই স্পষ্ট যে টীকা নিতান্ত বেয়াদবী।

চার

পূর্বের আলোচনার পর একথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা এবং নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যেতে পারে যে কান বিনে কবিতা-

সম্ভোগ প্রায় কানু বিনে কেলী করার সামিল। কবিরা এ তত্ত্ব ভাল করেই জানেন, নয়ত তাঁরা কবি হতেন না; কিন্তু ছাপাখানার দৌলতে পাঠকেরা ক্রমেই একথা প্রায় ভুলতে বসেছেন। কবিতার পক্ষে এটা দুর্দৈব; কেননা কানের মধ্যে দিয়ে না গেলে মরমে পশা কবিতার পক্ষে অসম্ভব। তার মানে অবশ্য এ নয় যে ছাপাখানা থাকতে কাব্যসম্ভোগের কোনো ভবিষ্যত নেই। ছাপাখানা যদি কবিতার সতীন হয়, তবে কবিতা দুয়োরাণীর আর কোনো দিনই রাজার ঘরে ফেরা হয়ে উঠবে না। কেননা এ যুগের এবং ভাবীযুগের রাজা হলেন জনসাধারণ এবং জনসাধারণের কাছে ছাপাখানার দাম স্বভাবতই কবিতার চাইতে অনেক বেশী। আমার প্রস্তাব শুধু এই যে কবিতাকে ছাপার হরফে ফেলে রাখলে তার দাম বোঝা যাবে না; তাকে কানের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিলেতে আজকাল কবিতা পাঠের গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরী হচ্ছে—আমাদের রেডিও কর্তৃপক্ষও সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু কিছু অবহিত হয়েছেন। কিন্তু সব থেকে বেশী অবহিত হওয়া দরকার পাঠকের। আর আসল বিপদ সেইখানে। কেননা আধুনিক সভ্যতায় মানুষের কান তৈরী হওয়া দূরের কথা, যেটুকু সহজাত সংবেদনশীলতা নিয়ে তারা জন্মায় তারো দফা রফা করবার হাজার ব্যবস্থা এ সভ্যতা করে রেখেছে। জন্ম থেকেই চারপাশে শুধু ট্রামবাস কলকারখানার কর্কশ ধ্বনির প্রতিযোগিতা; তারপর সিনেমা এবং রেডিও লাউড্‌স্পীকারের কল্যাণে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত; উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলতে যে শিক্ষা আমরা পাই তাতে অনুভূতির সূক্ষ্মতাসাধনের চাইতে অনুভূতির জড়ত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই বেশী। এ অবস্থায় সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কাব্যের সঙ্গীতধর্ম বিষয়ে ব্যাপক ঔদাসীন্য দেখা দেয় তাতে আশ্চর্যবোধ করা অযৌক্তিক। তবু যেহেতু সম্ভোগ ছাড়া জীবন নিরর্থ এবং যেহেতু কাব্যরস সম্ভোগ করতে না শিখলে আমাদের

জীবন দরিদ্র হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই, সেকারণে এ সম্ভোগের সামর্থ্য অর্জন করার জন্য পাঠক হিসেবে যদি আমরা উদ্যোগী না হই তবে তা যে আমাদের পক্ষে ঘোর নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে একথা বোধহয় যুক্তিতর্ক দিয়ে না বোঝালেও চলে। কবি এবং পাঠক উভয়েরই প্রয়োজনে এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগ সূত্র স্থাপনের প্রয়োজন আছে। ছবির প্রদর্শনী হয়; গানের জলসা আছে; কিন্তু কবিদের মুশায়েরা যে লোপ পেয়ে এল। বাটে, মাঠে, আঙ্গিনায় হোক, পাঁচজন রসিকের বৈঠকে হোক, নিভৃত নির্জনে হোক, কানের পথে কবিতা কি আর পাঠকের প্রাণে পৌঁছবে না?

আধুনিক কবিতা ও পাঠক

আধুনিক কবিতা সম্ভোগ করতে হলে পাঠকের অন্ততঃ দুটি গুণ থাকা দরকার—কাব্যবোধ এবং যুগবোধ। এর কোনটিই সুলভ নয় এবং সে কারণে উভয়েরই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

কাব্য বিষয়ে যাঁরাই আলোচনা করেন তাঁরাই সাধারণত ধরে নেন যে, কবিতার আবেদন সর্বজনীন এবং প্রতি মানুষই কমবেশী কাব্যরস-পিপাসু। এ প্রস্তাব প্রমাণসহ কিনা সে বিষয়ে আমার মনে কিছু সন্দেহ আছে। অন্ততঃ বর্তমানকালে আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা এ প্রস্তাব সমর্থন করে না। বাংলা দেশের যেটুকু জানি শিক্ষিত, এমনকি উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেও এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম যাঁরা যথার্থই কবিতা পড়তে ভালবাসেন, যাঁরা স্নবারি থেকে নয়, রসপিপাসার তাগিদে কাব্যের পাঠক, কাব্যগ্রন্থের ক্রেতা। ফলে পৃষ্ঠপোষক না পাকড়াতে পারলে অথবা নিজের গাঁটের পয়সা খরচ না করতে পারলে কবিতার বই ছাপানো শক্ত, বোধহয় অসম্ভব। প্রায় কুড়ি বছর ধরে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা প্রকাশ করেও বুদ্ধদেব বসুর "কবিতা" পত্রিকা তাই আজও আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারল না। স্রেফ কবিতা লিখে সংসার চালাতে হলে স্বয়ং রবিঠাকুরের কি হাল হ'ত? এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্য বিষয়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরা যত দুঃখের সঙ্গেই হোক না কেন একথা বোধ হয় স্বীকার করবেন যে সে সব দেশেও যথার্থ কাব্যানুরাগীরা সাধারণ পাঠকদের তুলনায় নিতান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ। ইয়েটস্-এর মত মহাকবির চাইতে ওড্‌হাউসের মত নিকৃষ্ট কাহিনীকারের পাঠক অনেক বেশী। রিল্‌কে সারা জীবন পৃষ্ঠপোষক পাকড়াও করার জন্যে উঞ্ছবৃত্তি করেন নি? পার্টির উর্দি ঘাড়ে না চাপালে আরাগঁ ক'জন পাঠকের কাছে পাত্তা পেতেন? এইত সেদিন কাগজে দেখলাম ডাইলান টমাসের অকালমৃত্যুর পর তাঁর

পরিবারের ভরণ পোষণের প্রয়োজনে ইংলণ্ডের সেরা কবিসাহিত্যিকেরা জনসাধারণের কাছে অর্থসাহায্যের জন্যে আবেদন করেছেন। অথচ এলিয়টের পর ইংরেজী ভাষায় টমাসের তুল্য প্রতিভাবান কবি আর দ্বিতীয়টি আজও দেখা যায় নি।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে এখনো অধিকাংশ সভ্যদেশে কাব্যপাঠ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ রূপে পরিগণিত। স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েদের পাঠ্য তালিকায় কবিতা-সঙ্কলনকে এখনো একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এ যেন অনেকটা পুণ্যের কাছে পাপের শ্রদ্ধা নিবেদন জাতীয় এক ধরনের ভণ্ডামি। কবিতাকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা এক কথা; কাব্যবিষয়ে রুচি গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া অন্য কথা। সে শিক্ষা কে দেবে? যাঁদের নিজেদেরই কাব্যবোধের বালাই নেই, তাঁরা অন্যের মনে কি করে সে বোধ জাগ্রত করবেন? কাব্যের শব্দার্থ ব্যাখ্যা করা পর্যন্ত যাঁদের দৌড় তাঁরা কবিতার সঙ্গে গদ্যের এবং তার চাইতেও যেটা বড় কথা কবিতার সঙ্গে পদ্যের যে মৌলিক পার্থক্য, তার খবর জানবেনই-বা কোথা থেকে আর দেবেনই বা কোন সূত্রে? কুমুদ মল্লিকে যাঁদের তৃপ্তি তাঁরা কি করে বুঝবেন "বনলতা সেন", "পাদধ্বনি" অথবা "যযাতি"র মত কবিতা শুধু বাংলায় কেন অন্য ভাষাতেও খুব বেশী লেখা হয় নি? এ কথা বুঝতে হলে যা দরকার তারই নাম কাব্য বোধ। আধুনিক কালে কোনো দেশেই যে সে বোধে সমৃদ্ধ লোকের সংখ্যা খুব বেশী একথা বিশ্বাস করা শক্ত। এবং বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা যে সে বোধ গড়ে তোলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, প্রায় এক যুগ কাল শিক্ষকতা-কাজে ব্যয় করার পর সে কথা স্বীকার করা অন্তত আমার পক্ষে আরও কঠিন। হিটি সাহেব তাঁর "আরবদের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছিলেন যে বেদুইনরা কাব্যরুচির মাপকাঠিতে মানুষের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিরূপণ করত। অন্তত এদিক থেকে আধুনিক কালের মানুষ যে বেদুইনদের সমধর্মী নয় তাতে সন্দেহ নেই।

ফলত অতীতযুগে যাই থেকে থাক, সম্প্রতিকালে কাব্যের বাজার মন্দা। এতে আধুনিক কালের কবিদের যতটা ক্ষতির সম্ভাবনা, তার চাইতে ঢের বেশী ক্ষতির নিশ্চয়তা আমাদের, অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের। মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ভাষা, এবং ভাষার সমৃদ্ধতম প্রয়োগ ঘটে কাব্যে। সে সম্পদ যে ভোগ করতে পারল না, হাজার গাড়িবাড়ির প্রাচুর্য সত্ত্বেও সে মানুষ দরিদ্র, দুর্ভাগা। এবং যে সমাজে অধিকাংশ মানুষ এজাতীয় দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন হবার পর্যন্ত সুযোগ পায় না, সে সমাজ যে সংস্কৃতির দিক থেকে নিতান্ত অনুন্নত তাতে সন্দেহ নেই। সেখানে হয়ত ছাপাখানা রেডিওর কল্যাণে সকাল বিকেল ঘরে ঘরে দুনিয়ার খবর পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আছে; সেখানে হয়ত বা নিরক্ষরতার সমস্যা অনুপস্থিত; এমন কি হয়ত আবশ্যিক শিক্ষারও বিধিবন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবু যে মানসিক সূক্ষ্মতা সাধনের ফলে মানুষ নিজেকে পুষ্ট এবং বিকশিত করে তোলে, তার যদি সেখানে অভাব ঘটে তবে শত উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক বিচারে সে সমাজ প্রায় দেউলে। মার্কিনের মানসিক দৈন্যদশা কি ডলারের দৌলতে দূর হয়েছে? বিপ্লবোত্তর রুশ ত' শুনি নিরক্ষরতা জয় করেছে; কিন্তু তার সঙ্গে সে দেশে মানসিক দাসব্যবস্থাও যে পাকাপোক্ত হয়ে বসল, তার কি? সাধারণ মানুষের চিৎপ্রকর্ষ সম্পাদনের প্রতি ব্যাপক ঔদাসীন্য কি আধুনিক সমাজসংকটের অন্যতম মূল সূত্র নয়? অতীতে শিক্ষার সুযোগ মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; আজ আমরা ঠেকে শিখেছি শিক্ষায় সর্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? সে শিক্ষার ফলে যদি মনের জড়তা, স্থূলতা এবং সঙ্কীর্ণতা দূর না হয়, যদি অনুভূতি না সূক্ষ্মতর হয়ে ওঠে, বুদ্ধি না সক্রিয় হয়, মুক্তিস্পৃহার যদি উজ্জীবন না ঘটে, তবে শুধু সংখ্যার সম্বলে আমরা কি বেশী দূর এগোতে পারব? শুধু খবরের কাগজের বনিয়াদে সংস্কৃতি গড়া যায় না; তার জন্যে ছবি, সুর, কবিতা সম্বন্ধে অনুভূতিকে জাগ্রত এবং পরিপুষ্ট করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দুই

অনেকে হয়ত প্রতিবাদ করে বলবেন যে শিক্ষিতদের মধ্যে কাব্যরুচি মোটেই অপ্রতুল নয়। আধুনিক কবিতার পাঠক কম বলে এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক যে কাব্যানুরাগীরা ক্রমে দুর্লভ হয়ে আসছেন। কালিদাস কি শেক্সপীয়রের ভক্তের আজও অভাব ঘটে নি। আধুনিকেরা এঁদের মতো কবিতা লিখতে পারেন না বলেই তাঁদের পাঠক জোটে না। আধুনিক কাব্যসম্ভোগে ব্যর্থকাম এইসব সমালোচক ক্লাসিক রুচির দোহাই দিয়ে আধুনিক কবিতা বিষয়ে ঔদাসীন্যের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। কিন্তু একটু সন্ধান করলেই জানা যাবে এ সমালোচকদের অধিকাংশই আসলে কাব্যরসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস।

তাঁদের এই আত্মবঞ্চনা ধরবার একটি সহজ উপায় আছে। এই আধুনিকতাবিরোধী রসিকদের শুধনো যাক, তাঁদের কাব্যবিচারের মানদণ্ড কি? সম্ভবত তাঁদের অনেকেই কোন পূর্বসূরীর বাণী উদ্ধৃত করে বলবেন, সরল, সরস এবং সাধারণবোধ্য কবিতাই সৎ কাব্য। আধুনিক কবিতা অসৎ কারণ তার বিষয় কুটিল, তার প্রকাশ নীরস, এবং তার ব্যঞ্জনা হয় অবোধ্য, নয় দুর্বোধ্য। ভাল কথা, এই মানদণ্ড মেনে নিয়েই না হয় দু'-একটা প্রশ্ন করা যাক। মিল্‌টনের উল্লেখ-অলঙ্কৃত মহাকাব্য কি গড়পড়তা পাঠকের জ্ঞানগোচর, নাকি সে কাব্য উপভোগ করতে হলে রীতিমত পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে? ঐ সাধারণ বুদ্ধির সম্বল নিয়ে ব্লেকের দ্যুতি-দুর্জ্ঞেয় কাব্যের অন্তরে প্রবেশ করা তাঁদের সামর্থ্যে কুলোয় কি? ব্রাউনিং-এর তড়িৎক্ষিপ্র কল্পনা, ঘটনার আকস্মিক উল্লম্ফন এবং ভাববিন্যাসের দুরূহ গোলকধাঁধা কি খুবই সরল এবং সহজভোগ্য? শেক্সপীয়রের শেষযুগের নাটকের ঠাসবুনোন ভাষার মুখোমুখী হয়ে তাঁদের সযত্নলালিত মধ্যভ্রূ বোধবুদ্ধি কি বিমূঢ়, বিপর্যস্ত বোধ করে না? এবং এ-সব স্বীকৃত সৎ কবিদের রচনা যদি দুরূহ এবং জটিল হয়েও সরস হতে পারে তবে এলুয়ার্‌

সুধীন্দ্র দত্ত অথবা অডেনের রচনাকেই বা দুর্বোধ্য বলে পরিহার করার কারণ কি? ব্যক্তিভেদে এই পৃথক বিচারের মধ্যে কি অসঙ্গতি নেই? উভয় ক্ষেত্রে কি একই মানদণ্ড প্রয়োগ করা হচ্ছে? আসলে সময়ের নিশ্চিত নির্দেশ ছাড়া আমাদের এই রসগ্রাহী বন্ধুদের সত্যই কাব্য-বিচারের অন্য কোন মানদণ্ড আছে কি?

বরাত খারাপ, সত্যিই এঁদের অন্য কোন মানদণ্ড নেই। আর তাই ত আধুনিকদের নিয়ে এঁদের এত বিড়ম্বনা। অতীত কবিদের মূল্যনির্দেশ সময়ের মাপকাঠিতে মোটামুটি নিরূপিত হয়ে যাওয়ায় তাঁদের নিয়ে বিশেষ ঝামেলা পোয়াতে হয় না। দান্তে, শেক্সপীয়র, গ্যয়টে কি ব্রাউনিং-এর বিচিত্র এবং বিশাল কাব্যাবলীর সামান্য অংশ পড়ে (অথবা মোটে না পড়েই) এঁদের মহাকবি বলে রায় দেওয়া চলে। কিন্তু সমকালীনদের কাব্য সম্ভোগে এবং সম্ভোগান্তে মূল্যনির্ণয়ে সময় কোনো সাহায্যই করে না। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ত' মহাকবি, কিন্তু হায়, কে এই রসিকদের বাতলে দেবে অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাস অথবা বিষ্ণু দে'র কবিতা ধোপে টিঁকবে কি-না। পরিণত কাব্যবোধ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। কিছু সময়ের হাত ধরে যাঁরা চিরদিন নিশ্চিন্ত আরামে চলে এসেছেন তাঁদের নিজেদের বোধ বুদ্ধি পরিণতি পাবার সুযোগ পেল কখন? সমকালীনের সান্নিধ্যে এসে সেই আয়েসী অপরিণতি হঠাৎ অনাবৃত হয়ে পড়ে বলেই আধুনিক কবিতার প্রতি এঁরা এত বীতরাগ।

অথচ একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে সমকালীন মানবচিত্তের সৃষ্টিমুখী প্রয়াসগুলিকে নিত্য-বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করার মধ্যেই ব্যক্তির রুচি এবং রসবোধের প্রকৃষ্ট পরীক্ষা। মহাকালের ছাঁকুনি এখানে কোন কাজেই আসে না। ভোক্তাকে একান্তভাবে নির্ভর করতে হয় নিজের বোধশক্তির ওপরে। বোধশক্তি একদিনে কিছু গড়ে ওঠে না। অনেক অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের দ্বারা তাকে পুষ্ট এবং

নিপুন করে তুলতে হয়। বোধশক্তির এই পরিপুষ্টির পথে ধীরে ধীরে ব্যক্তির মনে মূল্যবিচারের মূলনীতিগুলি আকার নিতে থাকে। যার মন অতীতের উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করে বিকশিত হয় নি তার জীবনে প্রাক্তন নির্দেশ বোঝা এবং বাধা মাত্র। কিছু অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে এবং অনুভূতির অনুশীলনে যে মন প্রকৃত বৈদগ্ধ্য অর্জন করেছে, প্রাচীন এবং আধুনিক সব কালের সার্থক রচনাই সে-মনে গভীর অনুরণন জাগাবে। ক্লাসিকের দোহাই দিয়ে সমকালীনকে বর্জন করার প্রয়োজন তার ঘটবে না।

ফলত প্রাচীন বা আধুনিক যে কোনো কবিতা উপভোগ করতে হলে প্রথমেই চাই যথার্থ কাব্যবোধ। শব্দের অন্তর্নিহিত জীবনে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা (কাব্যে শব্দ শুধু ত প্রতীক নয়, জীবন্ত সত্তাও বটে); প্রচলিত অর্থের আড়ালে তার ব্যঞ্জনা-সামর্থ্য উদ্‌ঘাটনের শক্তি ; তাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট বুনন-গঠন এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে এই বুনন-গঠনে সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটা বিষয়ে চেতনা; ছন্দ ও অর্থের দাম্পত্য সম্বন্ধে বোধ, এবং কাব্যরূপের অনুভূতির ফলে দৈনন্দিন সামান্যতার স্তর থেকে সমৃদ্ধতর চেতনায় উজ্জীবিত হবার সামর্থ্য—প্রকৃত কাব্যবোধের এই স্বরূপ। সাধারণতঃ এ বোধ যতটা সুলভ ভাবা হয় আসলে এটি তত সুলভ নয়। বিশেষ করে বর্তমান কালে জনজীবনে কাব্যরুচি ক্রমশই সঙ্কীর্ণ এবং ক্ষীণশক্তি হয়ে আসছে। যন্ত্র-সভ্যতার কল্যাণে অধিকাংশের রুচি ক্রমেই হয়ে উঠছে ছাঁচেগড়া। এ সভ্যতায় গুণের চাইতে পরিমাণের কদর বেশী। অল্প পরিশ্রমে কি করে বেশী জিনিস তৈরী করা যায়, সেটাই এ সভ্যতার মুখ্য ভাবনা ; ফলে বহু সাধনায় একটি বিশিষ্ট জিনিস তৈরী করা যে কাজের প্রকৃতি তার সম্বন্ধে এ সভ্যতার আগ্রহ ক্রমেই ক্ষীয়মান। সম্পদের পরিমাণ-বৃদ্ধির অবশ্যই প্রয়োজন আছে ; তা নাহ'লে সে সম্পদে সর্বসাধারণের অধিকার-প্রতিষ্ঠা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। এবং সেক্ষেত্রে মুখে

আমরা যতই গণতন্ত্রের বুলি আওড়াই না কেন, মানুষে-মানুষে সুযোগগত শ্রেণীভেদ আগের মতই বজায় থাকবে। সুতরাং, মানুষের বিকাশ সম্ভব করার প্রয়োজনে শ্রমের উৎপাদন-হার অবশ্যই বাড়াতে হবে, এবং যন্ত্রের প্রয়োগ ছাড়া সে উদ্দেশ্য নিষ্পন্ন করা অসম্ভব। কিন্তু উৎপাদন-হার বাড়াতে গিয়ে আমার যদি ক্রমেই উৎপন্নের অন্তর্নিহিত মূল্য খর্ব করতে থাকি, তবে মানুষের বিকাশের পথ সুগমতর হওয়ার জায়গায় তার বিকাশের সম্ভাবনাই যে ক্রমে শীর্ণতর, সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসবে। যে সব উৎপন্নের দ্বারা আমরা মুখ্যত আমাদের টিঁকে থাকার প্রয়োজনগুলো মেটাই, তাদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা হয়ত ততটা প্রকট নয়। কিন্তু যে সব কাজের মধ্যে টিঁকে থাকার প্রয়োজনের চাইতে বিকশিত হয়ে ওঠার তাগিদ বড়—যেমন সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন কি কবিতা —সেখানেও যদি সংখ্যা বা পরিমাণের হিসেবটাই বড় হয়ে ওঠে, তবে তাতে মানবজাতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা। এবং যন্ত্রসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্ভাবনা ক্রমেই অতি ভয়াবহ ভাবে বাস্তব হয়ে উঠছে। কালিঘাটের কাঠের পুতুল আর চোখে পড়ে না; প্লাষ্টিকের পুতুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা বুঝি লোপ পেয়ে গেল। মার্গসঙ্গীতের প্রতি আমরা সাধারণের রুচি তৈরী করতে পারলাম না; এধারে সিনেমার সস্তা-গানের দৌরাত্ম্যে লোকসঙ্গীতের দিনও ফুরোতে চলল। যা সূক্ষ্ম, জটিল অথবা অনন্য, যার রূপ একটি বিশেষ মনের তন্নিষ্ঠ সাধনার প্রকাশ, এক কথায় যা শিল্প, এবং সে কারণে ছাঁচে ফেলে যার বহুল পুনরুৎপাদন অসম্ভব, এ সভ্যতায় তার পোষণ এবং বর্ধন ক্রমেই কঠিনতর হয়ে উঠছে। বছর ছত্রিশ আগে প্রকাশিত "হিউ সেলওয়াইন" ম্যর্বলি কাব্যে এজ্‌রা পাউণ্ড তাই ব্যর্থ ক্ষোভে লিখেছিলেন :

The age demanded chiefly a mould in plaster
Made with no loss of time

A prose kinema, not, not assuredly alabastor
Or the 'sculpture' of rhyme.

প্ল্যাস্টারের ছাঁচের চাইতে বড় দাবি করার মত চেতনা যে সমাজে দুর্লভ সেখানে কাগজপত্রে যতই মৌল অধিকার স্বীকৃত হোক না কেন, সাংস্কৃতিক জীবনে গড্ডলতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু আশা করা কঠিন। যন্ত্রের সুযোগসুবিধা পুরোমাত্রায় নিয়েও মানুষের মনকে কি করে যান্ত্রিকতার হাত থেকে রক্ষা করা যায়, গণতন্ত্রকে কি ভাবে গড্ডলতন্ত্রের বিপদ থেকে রক্ষা করা সম্ভব, আধুনিক সভ্যতার এটি একটি মূল সমস্যা এবং আজকের দিনে সমাজসচেতন ব্যক্তি মাত্রেই এবিষয়ে অল্পবিস্তর ভাবতে শুরু করেছেন। এ অবস্থায় কাব্যের যেটি বিশেষ সম্পদ, আলঙ্কারিকেরা যার নাম দিয়েছেন ব্যঞ্জনা—এলিয়টের ভাষায় "শব্দ এবং অর্থের অসহ্য সংগ্রাম" থেকে যার জন্ম—তার সমঝদার কি এদেশে কি অন্যদেশে কোথাও যে আকৃছার মিলবে এ আশা দুরাশা। যান্ত্রিক বুদ্ধি জড়বস্তুর হিসেবে দড় হতে পারে, কিন্তু রিল্‌কে যাকে বলেছিলেন 'সংখ্যাতীত অস্তিত্বের উৎসরণ'—Uberzahliges Dasein entspringt mir im Herzen—যার অন্যতম প্রকাশের নাম কাব্যপ্রেরণা, তাতে অবগাহন করার সামর্থ্য এ বুদ্ধির অনায়ত্ত।

তিন

তবু এই ব্যাপক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের দিনেও কিছু সংপাঠক সব দেশেই মিলবে। এমন কি আজকের হতশ্রী বাংলা দেশেও এই কুলীন সম্প্রদায় একেবারে লোপ পান নি। সমকালীন কবিতা যদি এঁদের আত্মীয়তা অর্জন করতে পারে, তবে রসবঞ্চিত গোবিন্দদাসেরা কিছুকাল মুখ ফিরিয়ে থাকলেও হয়ত খুব বেশী ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু এই সহৃদয়জনদের কাছেও যদি আধুনিক কবিতা অনাত্মীয়রূপে প্রতিভাত হয় তবে কাব্যের সত্যই ঘোর দুর্দিন।

এখন কাব্য উপভোগে যে পাঠকের প্রায় সহজাত সামর্থ্য বর্তমান তাকেও সে ভোগশক্তি অব্যাহত রাখার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়। এর জন্য যেমন একধারে পূর্বসূরীদের মহৎ রচনাগুলি বারবার পড়া প্রয়োজন, অন্যধারে তেমনি সমকালীনদের নবনব পরীক্ষানিরীক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করাও একান্ত আবশ্যক। আধুনিক কাব্যের বিশেষ মেজাজটির সঙ্গে ভাল করে পরিচয় না গড়ে উঠলে যথার্থ কাব্যবোধ সত্ত্বেও সে-কাব্যের রসসম্পদ উপভোগ করা কঠিন। যাঁরা প্রাক্-আধুনিক কাব্যরীতিতে অভ্যস্ত তাঁদের পক্ষে প্রথম আলাপে সমকালীন কবিতার বিশিষ্ট মেজাজটিকে শুধু নতুন নয়, রীতিমত অনাত্মীয় ঠেকা কিছুই আশ্চর্য নয়। কারণ গত প্রায় ত্রিপাদ-শতাব্দীর সাধনার ভিতর দিয়ে আধুনিক কাব্যের বিশেষ একটি মেজাজ গড়ে উঠেছে। তার পরীক্ষানিরীক্ষা, রীতি-উপজীব্য সব-কিছুই এই মেজাজের অঙ্গ এবং প্রকাশ মাত্র। এ যুগের সৎপাঠক যদি এ যুগের সৎ কবিতা পড়ে সমৃদ্ধ হতে চান তবে এই মেজাজের সঙ্গে তাঁকে সবিশেষ ঘনিষ্ঠ হতে হবে।

সৎ পাঠক মাত্রই জানেন যে কবিপ্রকৃতির অন্তর্লোকে প্রবেশ করার প্রধান চাবিকাঠি হ'ল তার রীতি-প্রকরণ। এক মেজাজের কবিতা থেকে আর এক মেজাজের কবিতার ফারাক প্রথমত তাদের রীতিগত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই ধরা পড়ে। আধুনিক কবিতার মেজাজ বুঝতে হলে তার রীতি-প্রকরণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দরকার। আধুনিক কবি-কল্পনা অত্যন্ত সচেতন ভাবে ব্যক্তি-সাক্ষিক এবং ব্যঞ্জনাপ্রধান। এ মনোভাবের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর তার প্রতীক-প্রয়োগে এবং শব্দ-ব্যঞ্জনায়। রোমান্টিক আন্দোলনের প্রথম যুগেই এ মনোভাবের কিছু কিছু আভাস দেখা যায়। তারপর পো-র সাহিত্য-প্রবন্ধে এবং ব্যদ্লেয়ারের কবিতায় এ মনোভাব একটি সচেতন কাব্যরীতি প্রবর্তন করে। মালার্মের প্রতিভাস্পর্শে এ রীতিই সংস্কৃত এবং সমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক কবি-কল্পনার

স্বকীয় রীতি হয়ে ওঠে। এ রীতি অনুসারে কাব্যরূপ এক একটি প্রতীককে কেন্দ্র করে দানা বাঁধে, এবং সে প্রতীকের সর্বজনগোচর অর্থ যাই হোক না কেন তার ব্যঞ্জনার সূত্র নিহিত থাকে কবির একান্তভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারাজির মধ্যে। যে প্রতীক যতবেশী যথার্থভাবে অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাসমষ্টিকে একটি পরোক্ষ রূপে ধারণ করতে পারে, সে প্রতীক ততখানি সার্থক এবং ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। এ রীতির ঝুঁকি প্রচুর, কারণ ঠিকমত রাশ না টানলে এর পরিসমাপ্তি মিস্টিসিজ্‌মে। এবং ব্রেমঁ সাহেব যাই বলুন, মিস্টিসিজ্‌মের যেখানে পরিপূর্ণতা কবিতার সেখানে নির্বাণ।

আধুনিক কবির অভিধান-লঙ্ঘন শুধু প্রতীকের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নেই, শব্দার্থের ক্ষেত্রেও তা অনেকখানি বিস্তার লাভ করেছে। অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ ত' কবি মাত্রেই কমবেশী করে থাকেন, অপ্রচলিত অর্থে পরিচিত শব্দ প্রয়োগও কাব্যে মোটামুটি স্বীকৃত রীতি। কিন্তু এঁরা শব্দকে ভেঙে চুরে নিতান্ত ব্যক্তিগত অর্থে অভিনব বহু স্ফোটও ব্যবহার করেছেন। এঁদের বিশ্বাস তার ফলে ভাষার অপহৃত আদিম স্ফূর্তি কাব্যকে আশ্রয় করে ফিরে আসবে। এই যুক্তিতেই এঁদের কাছে শব্দসংস্থানের ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট সীমা নিতান্ত অগ্রাহ্য। এঁদের মতে কাব্যে শব্দ-সংস্থান শুধু দুটি সূত্রের দ্বারা যথার্থ নিয়মিত হতে পারে—তার একটি হ'ল ছন্দ, অপবটি ব্যঞ্জনা। এ দুটি সূত্রও পরস্পরেব মধ্যে অনুস্যূত। কাব্য-উপাদানের যৌগিক রসায়নে ব্যাকরণ-অভিধানের প্রভাব নিতান্ত পবোক্ষ। সে প্রভাব ততক্ষণই স্বীকার্য যতক্ষণ তা ছন্দ এবং ব্যঞ্জনাব নির্দেশাধীন।

আধুনিক কাব্যরীতির আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আধুনিক কাব্য উপভোগ করতে হলে তার বিশিষ্ট মেজাজ এবং রীতি-প্রকরণের সঙ্গে সংপাঠকের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া দরকার—এখানে শুধু সে প্রস্তাব-

টুকুই উপস্থিত করা হয়েছে। এ পরিচয় অনুশীলনসাপেক্ষ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ অনুশীলনের ফলে শুধু আধুনিক-কাব্যসম্ভোগের পথই যে সুগম হবে তা নয়, পাঠকের কাব্যবোধও সূক্ষ্মতা এবং প্রভূত পুষ্টি লাভ করবে।

চার

কিন্তু আধুনিক কাব্যসম্ভোগে শুধু অনুশীলিত কাব্যবোধ থাকাই যথেষ্ট নয়, আরো কিছু গুণের প্রয়োজন আছে—আমরা তাকে বলছি যুগবোধ। সময়ের স্রোত নিরবচ্ছিন্ন। হিসেবের সুবিধার জন্য কল্পনায় তাকে খণ্ডিত করলেও বাস্তবে তা' খণ্ডিত হতে পারে না। তাছাড় প্রতি খণ্ডিত সময়ের উপাদান হ'ল অসংখ্য ব্যক্তির বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই অনির্দেশ্য বহুমুখিনতাকে একটি অভিধার দ্বারা চিহ্নিত করলে চিন্তা এবং আলাপ সুসাধ্য হয় বটে, কিন্তু সত্যকথন হয় কিনা সন্দেহ। দার্শনিকের এ যুক্তি অকাট্য। অপর পক্ষে এ জাতীয় খণ্ড-কল্পনা ছাড়া, কি সাধারণ চিন্তা কি বৈজ্ঞানিক বিচার-অনুসন্ধান কিছুই সম্ভব নয়। এ ত্রুটি মানুষের ভাষা এবং ভাষা-নির্ভর জ্ঞানের অন্তর্নিহিত ত্রুটি। অপরোক্ষানুভূতিতে অস্তিত্বের স্বরূপ হয়ত-বা ধরা পড়ে, কিন্তু সে স্বরূপ বিষয়ে কোনো বিচার, বিশ্লেষণ বা অনুসন্ধান করতে হলে প্রতীকের সীমা মানা ছাড়া উপায় নেই।

সুতরাং ভাষাশ্রয়ী চিন্তার এই অলঙ্ঘ্য সীমাকে মেনে নিয়ে যদি আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তবে সহজেই নজরে পড়বে যে ইতিহাসে এমন কোনো কোনো বিশিষ্ট যুগ, পর্ব বা অধ্যায় আছে যাদের স্বকীয় ঐক্য পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কাল থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই ঐক্য একদিকে তাদের বহুমুখিনতায় এনেছে সমগ্রতার সঙ্গতি, অন্যদিকে প্রাক্তন এবং উত্তরকাল থেকে তাদের পৃথক করেছে।

তার অর্থ এ নয় যে তৎকালীন ব্যক্তিদের সমস্ত অভিজ্ঞতাসমষ্টিকে অতিক্রম করে যুগের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা আছে। আমার বক্তব্য শুধু এই যে নানা জটিল এবং বিচিত্র কারণের সমাবেশে বিশেষ বিশেষ সময়ে সেই সময়কার অধিকাংশ নরনারীর অভীপ্সা-অভিজ্ঞতায়, ব্যক্তিগত এবং পারস্পরিক জীবনযাত্রায় বহুত্বের মধ্যে এমন একটি সুগভীর ঐক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যার জন্য সেই কালকে বিশেষ একটি আখ্যায় অভিহিত করলে অসত্যালাপ হয় না। এর উদাহরণ রূপে উল্লেখ করা যায় রোমান সাম্রাজ্যের যুগ, স্কোলাষ্টিক সংস্কৃতির যুগ, রেনেসাঁস এবং পরে ফরাসী বিপ্লবের যুগ ইত্যাদি। বর্তমান শতাব্দী এমনি এক যুগের অবসান এবং নতুন যুগের সম্ভাবনার দ্বারা চিহ্নিত। আমরা তাই কালান্তর কালের মানুষ। কালান্তরেরও নিজস্ব নানা বিশিষ্ট লক্ষণ আছে; সেই সব লক্ষণ বিষয়ে চেতনাকে আমরা সমকালীন যুগবোধ বলতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ বোধ এ যুগের সব স্ত্রীপুরুষেরই থাকার কথা; আসলে কিন্তু অধিকাংশের মধ্যেই এ বোধ আজও খুব দুর্বল, প্রায় অপ্রত্যক্ষ। তার কারণ অন্যান্য জীবের মত মানুষও জড়জগৎ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং তার উপাদানগত জড়তাকে বশে আনার জন্য যতখানি চৈতন্যের প্রস্ফুরণ দরকার অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে আজও তা ঘটানো সম্ভবপর হয় নি। ফলে সময় যদিও আমাদের নিয়তই অলঙ্ঘ্য নিয়মে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে ঠেলে দেয়, তবু আমরা বেশীরভাগ মানুষই অভ্যস্ত অতীতজীবনকে আঁকড়ে ধরে আরাম পাই। কালের গতি এবং সত্তার বিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনকে পরিণতি বলে। পরিণত সত্তা অতি দুর্লভ বস্তু। অনেক মানুষই কালস্রোত সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের স্বল্প-চেতন। তাদের দেহ বদলায় কিন্তু মন বাড়ে না। পূর্বপুরুষগণ যে সব অভ্যাস-অনুভূতির বৃত্ত দাগ কেটে গেছেন তার গণ্ডি পেরোবার বীর্য কিম্বা কৌতূহল তাদের নেই। যে পরিণতি-জাত আত্মপ্রত্যয়ের জোরে

মানুষ কালের স্রোতে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রাখে, সে প্রত্যয় তাদের জীবনে অনাগত। ফলে এমন স্ত্রী পুরুষ প্রায়ই চোখে পড়ে যাঁরা সমকালীনতার দায়িত্বকে অপরিচয়ের সন্ত্রাসে সযত্নে পরিহার করে চলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও মনের বিকাশের দিক থেকে এঁরা বামন—অর্থাৎ আকারে বৃদ্ধ এবং প্রকারে শিশু।

ইতিহাসে যখনি কোন কালান্তর ঘটে তখন সৃষ্টিশীল এবং অভ্যাসাশ্রয়ী মনের মধ্যবর্তী ব্যবধান প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে দেখা দেয়। আমাদের যুগে এই ব্যবধান এতই বিরাট যে তার তুলনা সম্ভবত পূর্বতন কোন সভ্যতার ইতিহাসে মিলবে না। বর্তমান শতাব্দীতে স্বল্পকালের মধ্যে যে কালান্তর প্রকট হয়ে উঠেছে তা যেমন দ্রুত, তেমনি গভীর, তেমনি বহুমুখী এবং দূরপ্রসারী। আমাদের জীবিত কালের অভিজ্ঞতায় একটি বিরাট সভ্যতার বনিয়াদ চূরমার হতে চলেছে। অথচ এই সভ্যতা তার প্রভাবের ব্যাপ্তিতে যে বিশ্বজনীনতা অর্জন করেছিল, পূর্বকালীন কোন সভ্যতাই তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে নি। গত চারশ' বছরের মানব-ইতিহাস পশ্চিম ইয়োরোপের সভ্যতাকে কেন্দ্র করে এক বিশ্বব্যাপী সভ্যতা গড়ে ওঠার ইতিহাস। মধ্যযুগের অবসানে যে মানবতন্ত্রী জীবনবোধ ইয়োরোপের রেনেসাঁসে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল, যে বোধের সম্পদে পরবর্তী প্রায় চারশ' বছরের ইতিহাস পুষ্ট, এ শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অবক্ষয়ে সে বোধ আজ প্রায় উৎপাটিতমূল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু। রেনেসাঁস সব প্রয়াস-প্রচেষ্টার কেন্দ্রে ব্যক্তির বিকাশ-সাধনাকে স্থাপিত করেছিল এবং সেই সাধনায় তার প্রধান নির্ভর ছিল ব্যক্তির অনুশীলিত সত্যবুদ্ধি। গত প্রায় একশ' বছর ধরে নানা নতুন প্রভাব এবং সমস্যার চাপে এ সাধনায় কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেছে। এই কেন্দ্রচ্যুতির ভয়াবহতা বিশেষ করে গত চার দশকের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। সভ্যতার এ সঙ্কট

আজ আর কোনো বিশেষ দেশে বা মহাদেশে আবদ্ধ নেই, সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য আজ এ সঙ্কটের সঙ্গে জড়িত।

এ জাতীয় পরিবেশে যাঁরা সাধারণের অপেক্ষা অধিকতর অনুভূতি এবং কল্পনার অধিকারী তাঁদের মন যে দুঃসহ আর্তিতে মথিত হবে, এটা স্বাভাবিক। যে সভ্যতা চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়ছে তার প্রত্যয়ে তাঁদের মনুষ্যত্ব আশ্রয় পাচ্ছে না। অপরপক্ষে সমকালীন বিশৃঙ্খলাকেই সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলে মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। এ বিশৃঙ্খলাকে অতিক্রম করে মহত্তর সমন্বয়ে পৌঁছনোর দায়িত্ব তাঁদের। দায়িত্ব আছে, দায়িত্ববোধ আছে, অথচ দায়িত্বপালনের উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এ যে কি যন্ত্রণা ও-অভিজ্ঞতা যাঁদের ঘটেছে তাঁরাই জানেন।

সমকালীন, মানবমনের সব কিছু অর্থপূর্ণ আত্মপ্রকাশের কেন্দ্রে আছে এই কালান্তর-বোধের সুকঠিন বেদনা। এ বেদনার যাঁরা অংশভাক্ নন এ যুগের তাঁরা অনাত্মীয়। এ অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করতে পারলে তবেই সমকালীনতার অন্তর্লোকে প্রবেশের চাবিকাঠি মিলবে।

পাঁচ

যথার্থ আধুনিক কবিতায় এই সমকালীন কালান্তরবোধ কাব্যের নিজস্ব রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। এ বোধে বিদগ্ধ নন এমন কবিও এ যুগে নিশ্চয় আছেন, কিন্তু তাঁদের রচনাকে আধুনিক কবিতা বলা চলে না। এবং যে কবি নিজের যুগকে আত্মস্থ করতে পারেন নি, তাঁর কাব্য যে কোন দিন যুগোত্তর হবে এ সম্ভাবনা নিতান্ত সামান্য।

সুতরাং যুগবোধ যাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি, এমন কি কাব্যবোধে ধনী হলেও যথার্থ আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট আবেদনে সাড়া দেওয়া

তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন—প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। এমন পাঠক আমি জানি অনুশীলিত কাব্যবোধের সামর্থ্যে যাঁরা রিল্‌কে, ভালেরি, এলিয়ট অথবা পাউণ্ডের আশ্চর্য রূপদক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছেন, পুলকে শিহরিত হয়েছেন এঁদের ছন্দ-উপমা-উৎপ্রেক্ষার অসামান্যতায়—কিন্তু সমকালীনতার অন্তর্লোকে পৌঁছবার জন্য যে জীবনব্যাপী অকম্প্য অনুসন্ধান এঁদের কাব্যে বিকাশের ঐক্য এনেছে তার প্রতি এ পাঠকেরা অন্ধ অথবা উদাসীন।

প্রশ্ন উঠতে পারে আধুনিক কবিতা কি শুধু আর্তি আর হতাশারই কবিতা? তার কি কোন প্রতিশ্রুতিই নেই? না, সমকালীন কবিতাও প্রতিশ্রুতি-সমৃদ্ধ। কারণ প্রতি সার্থক কবিতা স্বয়ং একটি মহৎ প্রতিশ্রুতি। কবি স্রষ্টা, কবিতায় তিনি নিজেকে বার বার নূতন করে সৃজন করেন, সে সৃজনে তাঁর মুক্তি। অভিজ্ঞতার উপাদান-সমষ্টিকে আয়ত্তে এনে একটি ব্যঞ্জিত ছন্দোময় ঐক্যে তাদের সংস্থিত করতে পারলে তবেই না কবিতার জন্ম হয়। প্রবৃত্তি এবং পরিবেশ উভয়েরই বন্ধন থেকে মনকে যিনি ঊর্ধ্বে তুলতে পেরেছেন তিনি স্রষ্টা। জৈব আবেগ-অনুভূতি এবং প্রাকৃতিক ঘটনাস্রোতের না আছে নিজস্ব রূপ, না আছে অর্থসঙ্গতি। যা অস্থায়ী, জঙ্গম, নিরর্থ, রূপহীন তাকে সুমিত, সাকার, সার্থক করে তুলে শিল্পী নিজে মুক্তির স্বাদ লাভ করেন, ভোক্তাদের মুক্তির স্বাদ দান করেন। চিত্রশিল্পীর মুক্তি রেখা ও বর্ণের মাধ্যমে, সুরকারের মুক্তি ধ্বনির সুমিত অন্বয়ে, আর কবির মুক্তি শব্দের ব্যঞ্জনায়। মুক্তির অমৃতস্বাদ বহন করে আনে বলেই কাব্য আমাদের কাছে এত মূল্যবান। এই মুক্তির স্বাদ হ'ল সব যুগের, সব দেশের সার্থক কবিতার সব চাইতে বড় প্রতিশ্রুতি। এ প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণের জন্য ভবিষ্যকালের অপেক্ষা করতে হয় না, কারণ এ প্রতিশ্রুতি কবিতার মধ্যেই সার্থকান্বিত। কালান্তরের সুকঠিন বেদনা সমকালীন কবিতার মূল উৎস ঠিকই। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা কাব্যরূপে পরিস্রুত

হয়ে বেদনা-হতাশা-অতিক্রান্ত মহৎ মুক্তির প্রামাণিক প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছে। জৈব ভাব-আবেগ-রাশিকে শিল্প-অভিজ্ঞতায় সংস্থিত এবং সে কারণে রূপান্তরিত করতে পারলে তবে শিল্পক্রিয়ার সার্থকতা। আধুনিক কবি-কল্পনার উপলক্ষ তাই পোড়োজমি হলেও কাব্যের সার্থক কর্ষণে সে জমি সোনালী ফসলে ঝলমল করে উঠেছে।

* * *

অতএব আধুনিক কাব্য সম্ভোগে পাঠকের অন্ততঃ দুটি গুণ থাকা দরকার—কাব্যবোধ এবং যুগবোধ। আরো গুণ থাকলে আরো ভালো—যথা, পূর্বসূরীদের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়; অন্য যুগের বিশিষ্ট আধুনিকদের রূপগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান; নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং ইতিহাস বিষয়ে কমবেশী চর্চা; এ যুগের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে ধারাবাহিকতা বিষয়ে বোধ---ইত্যাদি। এসব গুণ থাকলে আধুনিক কবিতার খুঁটিনাটি, আঙ্গিক, প্রতীক, উল্লেখ, উদ্ধৃতি অনুধাবন করা সুসাধ্য হয়। কিন্তু এসব গুণ প্রাথমিক প্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে না। এসবের স্বল্পতা, এমনকি অভাব সত্ত্বেও আধুনিক কবিতার অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব—যদি পাঠক প্রথমোক্ত গুণদুটিতে যথার্থই গুণী হন।

যথেষ্ট যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেল। আশা করি তার অধিকাংশই তেমন মারাত্মক নয়, সহৃদয় পাঠক নিজ গুণে শুধরে নিতে পারবেন। মারাত্মক ভুল যে ক'টি চোখে পড়েছে নিচের শুদ্ধিপত্রে সেগুলি উল্লেখ করা হল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯	১	শব্দটির	শব্দ'টুটির
৫৫	২১	কিছু	কিন্তু
৬৩	৬	সমাজ সংস্কার ক্রিয়ার	সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত
৬৩	১০-১১	সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ সংগ্রহ করি-য়াছেন, যথার্থ বটে	সংগ্রহ করিয়াছেন যথার্থ বটে
৮৩	১৭	সূর্য্যমিত	সুষমিত
৯৪	২২	সুতারং	সুতরাং
৯৪	২৩	তেমার পানে নিবিড় টানে বেদন ভরা মুখ	তোমার পানে নিবিড় টানের বেদন-ভরা মুখ
৯৫	১	"আকাঙ্খা"	"আশঙ্কা"
৯৫	২১	আঁখি যার করেছিল কথা	আঁখি যার কয়েছিল কথা
৯৬	৩	"পূবরী"	"পূরবী"